গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু

প্রফেসর সৈয়দা নাসরীন বানু

প্রফেসর ইসমাত রুমিনা

সোনিয়া বেগম

গাজী হোসনে আরা

শামসুন নাহার বীথি

সৈয়দা সালিহা সালিহীন সুলতানা

রেহানা ইয়াছমিন

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান একটি জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। এই বিষয়ে অর্জিত দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও এর অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে, গৃহ ও গৃহের বাইরে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবিলা করতে এবং গৃহপরিবেশে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য দক্ষ ও কৌশলী করে তুলবে। অষ্টম শ্রেণির **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান** পাঠ্যপুস্তকটি এসব বিষয় বিবেচনা করে এবং সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিভাগ ও অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	ক বিভাগ : গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহ সম্পদ (১–৩১)	
প্রথম	গৃহ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার	২–১৩
দ্বিতীয়	গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা	১৪–২৩
তৃতীয়	গৃহে রোগীর শুশ্রূষা	২৪–৩১
	খ বিভাগ : শিশুবিকাশ ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (৩২–৬৩)	
চতুর্থ	রোগ সম্পর্কে সতর্কতা	৩৩–৪৪
পঞ্চম	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু	৪৫–৫২
ষষ্ঠ	বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা	৫৩–৬৩
	গ বিভাগ : খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা (৬৪–১০৮)	
সপ্তম	খাদ্য পরিকল্পনা	৬৫– ৭৯
অষ্টম	অপুষ্টি	৮০–৮৭
নবম	পরিবারের জন্য খাদ্য নির্বাচন, ক্রয় ও প্রস্তুতে সতর্কতা	৮৮–৯৯
দশম	খাদ্য রান্না	১০০–১০৮
	ঘ বিভাগ : পোশাক-পরিচ্ছদ ও বস্ত্র (১০৯–১৩১)	
একাদশ	সুতা তৈরি ও বুনন	১১০–১১৪
দ্বাদশ	পোশাক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়	১১৫– ১২০
ত্রয়োদশ	পোশাক ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়	১২১–১২৩
চতুর্দশ	পোশাক তৈরি	১২৪–১৩১

ক বিভাগ

গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহ সম্পদ

পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। সময়, শক্তি, অর্থ পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে জীবনে শৃঙ্খলা আনা যায়। পরিবারের যৌথ সম্পদগুলো শনাক্ত করে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জীবন যাতে বিপন্ন না হয় সেজন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। রোগীর পরিচর্যা এবং তার কক্ষের সাজসরঞ্জাম কীভাবে রোগীর শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি এনে দেয় সে সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা জরুরি।

এই বিভাগ শেষে আমরা-

- গৃহ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গৃহ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারব;
- পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- গৃহে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনার সাধারণ কারণসমূহ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও সরঞ্জামাদির বর্ণনা করতে পারব ;
- পরিবারের অসুস্থ সদস্যের কক্ষ ও তার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি , নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নিরূপণের নিয়ম বর্ণনা করতে পারব;
- রোগীর শারীরিক ও মানসিক যত্নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম অধ্যায়

গৃহ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

পাঠ ১–গৃহ সম্পদ

সম্পদ হচ্ছে আমাদের সকল চাহিদা পূরণের হাতিয়ার। গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা থেকে আমরা জেনেছি যে, পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমাদের নানাবিধ কাজ করতে হয়। প্রতিটি কাজ করতে আমাদের কোনো না কোনো সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সম্পদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি অর্থ, জমিজমা, বাড়িঘর, গহনা ইত্যাদি। কিন্তু এসবের বাইরেও আমাদের আরও অনেক সম্পদ আছে। যেমন শক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, মনোভাব ইত্যাদি। এগুলো যে সম্পদ সে সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই কোনো ধারণা নাই। অথচ মানুষের এই গুণগুলো তার সম্পদের ভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে। উল্লিখিত দুই ধরনের সম্পদই আমাদের গৃহ সম্পদ হিসাবে পরিচিত।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় গৃহ সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। গৃহ সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য এই গৃহ সম্পদসমূহ সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

সকল সম্পদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

- **সম্পদের উপযোগ :** উপযোগ হচ্ছে দ্রব্যের সেই গুণ যা দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। সকল সম্পদেরই কমবেশি উপযোগিতা রয়েছে। অর্থাৎ সকল সম্পদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে। তবে সম্পদভেদে এর তারতম্য দেখা যায়। টেবিল, চেয়ার ব্যবহার করে আমরা লেখাপড়া করি, তাই এগুলো সম্পদ।

- **সম্পদের সীমাবদ্ধতা :** সম্পদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সকল সম্পদই সীমিত। যেমন–একজন ব্যক্তির সারা দিন-রাত্রি মিলিয়ে চব্বিশ ঘন্টা সময়, যা একেবারেই সীমিত। আবার একটা পরিবারের সীমিত আয় বা সীমিত জায়গা ইত্যাদি সম্পদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে।

- **সম্পদের ব্যবহার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল :** যে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য একক কোনো সম্পদ ব্যবহার না করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম সম্পদ একত্রে প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো কাজ করতে গেলে অর্থ, সময়, শক্তি, দক্ষতা ইত্যাদি একাধিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সম্পদের যৌথ ব্যবহারে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

- **সকল সম্পদই ক্ষমতাধীন :** সম্পদকে ব্যক্তির মালিকানাধীনে বা আয়ত্ত্বে থাকতে হবে। যদি কোনো দ্রব্য নিজের ক্ষমতাধীনে না থাকে বা একে যদি কোনো অধিকার দ্বারা কাজে লাগানো না যায়, তবে তা সম্পদ নয়।

কোনো কোনো সম্পদ হস্তান্তর করা যায়। যেমন-বাড়িঘর, অর্থ, জমিজমা, বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদি। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা, শক্তি, সামর্থ্য, দক্ষতা, সময় ইত্যাদি সম্পদগুলো কখনো হস্তান্তর করা যায় না। কারণ এগুলো মানুষের নিজস্ব অন্তর্নিহিত গুণাবলি। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু সম্পদ চর্চা বা অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন—জ্ঞান, দক্ষতা, শক্তি ইত্যাদি। আয় বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে পরিবারের অর্থ সম্পদও বাড়ানো যায়।

গৃহ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

প্রত্যেক মানুষই কমবেশি বিভিন্ন রকম সম্পদের অধিকারী। যেহেতু সম্পদ ছাড়া কোনো লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না, তাই প্রত্যেক মানুষ তার কিছু কিছু সম্পদের অধিকার এবং তা বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেতন। যেমন-অর্থ, জমিজমা ইত্যাদি। কিন্তু সম্পদের ধরন, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকের সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। ফলে অচেনা, অজানা সম্পদগুলো ব্যবহার করতে না পারায় অনেকে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। গৃহ ব্যবস্থাপনায় আমরা যা কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করি তাই সম্পদ হিসাবে পরিচিত। গৃহ সম্পদের শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে আমরা সবরকম সম্পদ সম্বন্ধে জানতে পারি এবং লক্ষ্য অর্জনে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারি। গৃহ সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

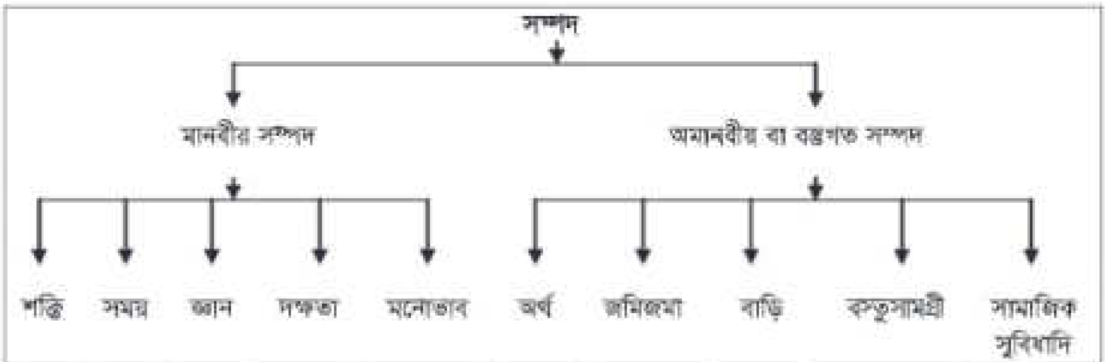

মানবীয় সম্পদ

যেকোনো পরিবারে একাধিক সদস্য বাস করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, তারা অনেকে অনেকরকম গুণের অধিকারী। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, বুদ্ধি, শক্তি, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি গুণগুলো মানবীয় সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত। এ সম্পদগুলোকে বস্তুগত সম্পদের মতো দেখা বা পরিমাপ করা যায় না। অথচ এগুলোর ব্যবহার দ্বারা অনেক লক্ষ্য অর্জন করা যায়। মানবীয় সম্পদগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের ও পরিবারের অনেক উন্নয়ন ঘটাতে পারি।

অমানবীয় বা বস্তুগত সম্পদ

আমাদের বাড়িঘর, জমিজমা, অর্থ, গৃহের যাবতীয় সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, গয়না, সামাজিক সুবিধাদি সবই বস্তুগত সম্পদ। এ সম্পদগুলো দেখা যায়, পরিমাপ করা যায়। এ সম্পদগুলোর দ্বারা আমরা অনেক চাহিদা পূরণ করি। বস্তুগত সম্পদের মধ্যে অর্থ অর্থাৎ টাকাপয়সা সবচেয়ে মূল্যবান এবং কার্যকর সম্পদ। কারণ অর্থের বিনিময়ে আমরা অন্য বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহ করি।

পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুগত উভয় সম্পদই সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা হয়। সব সম্পদই যেহেতু মূল্যবান, তাই এগুলোর ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে। সম্পদের সদ্ব্যবহার দ্বারা আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেও আমরা সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

কাজ-১ তোমার বাড়ির বস্তুগত সম্পদের একটা তালিকা করো।
কাজ-২ তোমার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের কী কী মানবীয় সম্পদ আছে বলে তুমি মনে করো?

পাঠ ২–সময় ও শক্তির পরিকল্পনা

লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেকোনো কাজ করতে গেলে আমাদের একই সাথে সময় ও শক্তি দুটি সম্পদ ব্যবহার করতে হয়। তাই আমরা এখন একসঙ্গে দুটি সম্পদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব।

সময় পরিকল্পনা

মানুষের জীবনে সময় এমনই এক সম্পদ, যা সবার জন্য সমান এবং একেবারেই সীমিত। এই সীমিত সম্পদের মধ্যে যে ব্যক্তি যত বেশি অর্থবহ কাজ দিয়ে নিজেকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবে, জীবনে সে তত বেশি সফলকাম হবে। সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রতিদিন আমাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা সময় বরাদ্দ রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই একে বাড়ানো সম্ভব নয় অথচ চাহিদা অনুযায়ী আমাদের অনেক কাজ করার থাকে। সে কারণেই সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কম সময় ব্যয় করে বেশি কাজ করা এবং সময়ের অপচয় না করা। আর সেজনাই আমাদের সময়ের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। একদিনে আমরা কী কী কাজ করব, কখন করব, নির্দিষ্ট কাজে কতটুকু সময় ব্যয় করব ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি লিখিত পরিকল্পনা বা সময়-তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা

- করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা হয়। কোন কাজগুলো বেশি এবং কোনগুলো কম প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।
- সময়মতো কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠে। কাজের সময় নির্ধারিত থাকে বলেই সময়ের কাজ সময়ে করার অভ্যাস গড়ে উঠে।
- প্রতিটা কাজে কতটুকু সময় ব্যয় হয়, তার ধারণা জন্মে।
- কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে। সময় তালিকা অনুসরণ করলে সময়মতো কাজ শেষ হয়ে যায়। বাড়তি সময়ে বিভিন্নরকম সৃজনশীল কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।
- বিশ্রাম, অবসর ও বিনোদন করা সম্ভব হয়। কারণ সময়-তালিকায় কাজ, বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে।

ছোটবেলা থেকেই আমাদের সবারই সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। সময়মতো সব কাজ করলে কাজ জমে যায় না। ফলে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সহজেই সম্পন্ন করা যায়। যেমন– ছাত্রছাত্রীরা যদি প্রতিদিনের পড়ালেখা সময়মতো সম্পন্ন করে, তাহলে সে খুব সহজেই কৃতকার্য হতে পারবে। আর যে সময়মতো পড়ালেখা করে না, পরীক্ষার সময় পড়া তার কাছে বোঝা মনে হবে। সময়মতো পড়ালেখা না করার জন্য তখন এই সমস্যা তৈরি হবে। তাইতো একটা প্রচলিত বচন আছে যে, "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়"।

সময়-তালিকা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

সময়-তালিকা করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন–

- দৈনিক করণীয় কাজগুলো নির্ধারণ করতে হবে।
- গুরুত্ব অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- যৌথভাবে কাজ করতে হলে, অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- সময়-তালিকায় কাজ, সময়, বিশ্রাম, ঘুম ও অবসর সময় উল্লেখ রাখতে হবে।
- একটা কঠিন বা ভারী কাজের পর হালকা কাজ বা বিশ্রাম দিতে হবে।
- সময়-তালিকা নমনীয় হতে হবে, যাতে প্রয়োজনে রদবদল করা যায়।

কাজ–১ সময়-তালিকা করে কাজ করলে কী কী সুবিধা হয়, আর সময় তালিকা করে কাজ না করলে কী কী অসুবিধা হয় তার তুলনা করো।

কাজ–২ তোমার নিজের জন্য সারাদিনের একটি সময় তালিকা তৈরি করো।

শক্তি পরিকল্পনা

অর্থ ও সময়ের মতো শক্তিও পরিবারের একটি অন্যতম সম্পদ। মানবীয় এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ফলে পরিবারের অনেক লক্ষ্য অর্জিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে শক্তির তারতম্য ঘটে। শক্তির সদ্ব্যবহারের দিকে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। কোনো একটি কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সে কাজে কম শক্তি ব্যবহার হয়। তাহলেই আমাদের সীমিত শক্তি দিয়েও অনেক কাজ করতে পারব। শক্তিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে, তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। তাই শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর ফলে শক্তির অপচয় রোধ করা যায়। শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়, সেখানে কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে–

- সারাদিনের একটা কর্ম-তালিকা করতে হবে,যেখানে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সময় অনুযায়ী সাজানো থাকবে।
- কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কোন কাজে কতটা শক্তি লাগে, কীভাবে সহজে কাজটা করা যায় সে দিকে নজর দিতে হবে।
- ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিলে আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে কাজটা সমাপ্ত করা যায়।

- বয়স অনুযায়ী কাজ ভাগ করতে হবে। সব বয়সে কাজ করার সামর্থ্য একরকম থাকেনা, সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে।
- একই সময়ে কেবল একটি কাজ হাতে নিতে হবে। কাজটি শেষ হওয়ার পর যে মানসিক তৃপ্তি আসে, তা কাজের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়।
- কাজের সময় দুই হাতই ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রেখে কাজ করতে হয়। যেমন– ঘর বসে না মুছে দাঁড়িয়ে মুছলে শক্তি কম খরচ হয়।
- ভারী কাজের পর বিশ্রাম বা হালকা কাজ রাখতে হয়।
- কাজ সহজকরণ এবং শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে শক্তির সদ্ব্যবহার করা যায়।

ঘর দাঁড়িয়ে মুছলে শক্তি কম খরচ হয়

কাজ সহজকরণ ও শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায় হলো–

- **সময় পরিকল্পনা করা** - প্রতিদিনের কাজের একটা তালিকা থাকবে, যা অনুসরণ করে অনায়াসে কাজগুলো করা যায়।
- **বাড়ির সঠিক নকশা করা** - রান্নাঘরের পাশে খাবারঘর থাকলে, হাঁটাচলায় শক্তি কম খরচ হবে।
- **শ্রম বিভাজন করা** – পরিবারে কাজগুলো বয়স, দক্ষতা, পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলে, একজনের উপর সব কাজের চাপ পড়ে না।
- **কাজের উপযুক্ত স্থানে সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে রাখা** – প্রত্যেকটি কাজ তার নির্ধারিত স্থানে করলে শক্তির অপচয় হয় না। একটা কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো সঠিক স্থানে রাখলে সহজে, কম শ্রমে কাজ করা যায়।

ছেলেমেয়েরা তাদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঠিক স্থানে গুছিয়ে রাখলে প্রয়োজনের সময় সহজেই খুঁজে পাবে

রান্নাঘরে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো সঠিক স্থানে রাখলে সহজে ও কম শ্রমে কাজ করা যায়

- **বিভিন্ন শ্রমলাঘব সাজসরঞ্জামের ব্যবহার** – গৃহে ওয়াশিং মেশিন, প্রেসার কুকার, রাইস কুকার, মাইক্রো ওয়েভ ওভেন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদি ব্যবহার করলে সময় ও শক্তির সাশ্রয় হয়।

ওয়াশিং মেশিন

মাইক্রো ওয়েভ ওভেন

প্রেসার কুকার

রাইস কুকার

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

কাজ– বিভিন্ন রকম শ্রমলাঘব সাজসরঞ্জামের একটা তালিকা করো।

পাঠ ৩–অর্থ পরিকল্পনা

অর্থ পরিবারের একটি অন্যতম ও প্রধান বস্তুগত সম্পদ। প্রতিটি পরিবারে কমবেশি অর্থ বা টাকাপয়সা আছে। অন্যান্য সম্পদের মতো অর্থ সম্পদও অত্যন্ত সীমিত। এই সীমিত অর্থ দ্বারাই পরিবারের সব ব্যয়ভার মেটানো হয়। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন উপায়ে এই অর্থ উপার্জন করে থাকে। আমাদের চাহিদা অনেক, কিন্তু সেই তুলনায় অর্থ খুবই সীমিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করতে পারলে আমাদের চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব এবং অর্থের অপচয় হয় না।

অর্থ পরিকল্পনা করতে হলে পরিবারের মোট আয়ের পরিমাণ এবং ব্যয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনা না থাকলে অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ নাও হতে পারে। পরিবারের লক্ষ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করতে হবে, যাতে তুলনামূলকভাবে অধিক প্রয়োজনগুলো আগে পূরণ করা যায়।

অর্থ পরিকল্পনার প্রধান কৌশল হলো বাজেট। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য সীমিত অর্থের ভবিষ্যৎ খরচের পরিকল্পনাই হচ্ছে বাজেট। সহজ করে বলা যায়, বাজেট হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা।

বাজেট করার প্রয়োজনীয়তা–

- বাজেট করলে পরিবারের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয়।
- আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায়।
- বাজেটে সঞ্চয়ের খাত থাকাতে, পরিবার সঞ্চয় করতে পারে।
- বাজেটের সাহায্যে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করা সম্ভব।
- বাজেট অর্থের অপচয় রোধ করে, সচ্ছলতা আনতে সাহায্য করে।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের মিতব্যয়ী হতে শেখায়।

অর্থ পরিকল্পনা

পারিবারিক বাজেট তৈরির নিয়ম

পরিবারের আয়ের তারতম্যের জন্য বাজেট বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– দৈনিক বাজেট, মাসিক বাজেট ইত্যাদি। অর্থ পরিকল্পনা করতে হলে মূল তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে–

প্রথমত, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ভিত্তিতে আমাদের চাহিদা তৈরি হয়। তাই অর্থ পরিকল্পনার সময় আগে লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিদের অর্জিত মোট আয় নিরূপণ করতে হবে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থগুলোকে একসাথে যোগ করে পরিবারের আয়কৃত অর্থ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, পরিবারের ব্যয়ের বিভিন্ন খাত নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের খাতগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজাতে হবে। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, সঞ্চয়, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি ব্যয়ের খাতগুলো ঠিক করে, কোন খাতে কত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে, তা স্থির করতে হবে। প্রত্যেক খাতের কিছু উপখাতও আছে। খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সেই উপখাতগুলোতেও বরাদ্দ দিতে হবে।

পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় এনে অর্থ পরিকল্পনা করতে হবে। অন্যান্য পরিকল্পনার মতো অর্থ পরিকল্পনার সময় পরিবারের সকল সদস্যের উপস্থিতি ও তাদের মতামত বা পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব দিতে হবে। পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করলে পরিবারে অর্থ সংকট দেখা দিবে না এবং যেকোনো পরিস্থিতি সহজেই মোকাবিলা করতে পারবে।

অর্থ ব্যয়ের তালিকা তৈরি করার সময় বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারদরের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয়ের পরিকল্পনা করা যাবে না। দরকার হলে কম প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাজেট তৈরি হয়ে গেলে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়ন করতে না পারলে পরিকল্পনা কোনো কাজে আসবে না। বাজেট বাস্তবায়নের দ্বারা অর্থ ব্যয়ের সদাভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

অবশেষে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে, বাজেটটি কতটুকু ফলপ্রসূ হলো। পরিকল্পনাটি সফল না হলে, তার কারণ খুঁজে সংশোধনের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

বাজেটটি যেন সুষম হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আয় ও ব্যয়ের অর্থ সমানভাবে মিলে গেলে, তাকে সুষম বাজেট বলে। যেমন– কোনো পরিবারের আয় যদি মাসে বিশ হাজার টাকা হয় এবং বাজেটের খাতগুলোতে যদি ঐ টাকায় সংকুলান হয়ে যায় তাহলে সেটা সুষম বাজেট। আর ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয়, সেটা হবে ঘাটতি বাজেট। ঘাটতি বাজেট আমাদের কখনই কাম্য নয়। এরকম বাজেটে পরিবারে প্রতিমাসে ঋণের বোঝা বাড়ে।

সবচেয়ে ভালো হচ্ছে উদ্বৃত্ত বাজেট। এই বাজেটে পরিবারের সব খরচ মেটানোর পরও কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে আরও চাহিদা পূরণ করা যায়। আবার তা সঞ্চয় করে রাখলে ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

কাজ–১ বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

কাজ–২ তোমার ক্লাস পার্টির জন্য একটি ব্যয়ের পরিকল্পনা করে দেখাও।

পাঠ ৪–পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

আমাদের প্রতিটি গৃহে এমন কতকগুলো নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র থাকে, যা পরিবারের যৌথ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। পরিবারের সব সদস্য যৌথভাবে সে সম্পদগুলো ব্যবহার করে থাকে। যেমন– বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, খবরের কাগজ, টেলিফোন, টয়লেট, কলতলা, কুয়ার পানি, আঙিনা ইত্যাদি। যৌথ সম্পদগুলোর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ ব্যবহারে সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলার ফলে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে।

পারিবারিক যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। সমঝোতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে যৌথ সম্পদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, পরিবারের সকলের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা যায়।

বাতি– কাজের সুবিধার জন্য আমরা গৃহের প্রতিটি কক্ষে আলো ব্যবহার করে থাকি। কাজ অনুযায়ী বাতির তীব্রতা কমবেশি হয়ে থাকে। এক কক্ষে দুই-তিনজন সদস্য থাকলে প্রত্যেকের বিভিন্ন রকম কাজ থাকতে পারে। কিন্তু সবার জন্য পৃথক আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। যেমন-সাধারণত শোবার ঘর আমরা পড়া ও ঘুমের জন্য ব্যবহার করি। একই ঘরে একজন যদি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, তবে আরেকজন টেবিলল্যাম্প ব্যবহার করে পড়তে পারে। তাহলে প্রত্যেকের জন্য সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি হবে। যেসব কাজ একই আলোতে করা যায়, তার জন্য আলাদা আলোর ব্যবহার করলে অর্থের অপচয় হয়। কাজ শেষে বাতি নিভিয়ে ফেলার অভ্যাস প্রত্যেক সদস্যের থাকতে হবে, যাতে এ সম্পদের অপচয় না হয়।

বৈদ্যুতিক পাখা– একটি কক্ষে একাধিক সদস্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কক্ষের একটি পাখায় সব সদস্যের প্রয়োজনীয় বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজন বুঝে এ পাখা ব্যবহার করতে হবে। যার বেশি বাতাসের প্রয়োজন, সে পাখার সোজাসুজি নিচে থাকবে। আর যার কম বাতাসের প্রয়োজন, সে পাখা থেকে দূরে থাকতে পারে। অসুস্থ কোনো সদস্যের পাখার বেশি বাতাসে ক্ষতি হলে, আস্তে পাখা চালাতে হবে। অর্থাৎ পরিস্থিতি বুঝে সমঝোতার সাথে পাখা ব্যবহার করতে হবে।

খবরের কাগজ– খবরের কাগজের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবর পাওয়া যায়। খবরের কাগজ সবাইকে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। বাড়িতে বড়রা প্রথমে খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। বিশেষ করে যারা অফিসে বা বাইরে যাবেন, তাদের আগে পড়ার সুযোগ দিতে হয়। এরপর ছোটরা সমবেতভাবে বা পর্যায়ক্রমে পড়তে পারে। অনেক সময় দেখা যায় খবরের কাগজে কোনো উত্তেজনাপূর্ণ খবর বের হয়েছে, বা জানার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব থাকে। সেক্ষেত্রে একজন জোরে পড়লে, অন্যরাও শুনতে পারে। এতে সবাই মিলিতভাবে আনন্দ পেতে পারে। আবার নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন পৃষ্ঠা ভাগ ও অদলবদল করে কয়েকজন একই সময়ে পড়তে পারে। পড়া শেষে সব পৃষ্ঠা পরপর সাজিয়ে ভাজ করে নির্দিষ্ট স্থানে তারিখ অনুসারে সাজিয়ে রাখতে হয়।

টেলিফোন– যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম হচ্ছে টেলিফোন। একজন অনেকক্ষণ কথা বললে, অন্যের জরুরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটতে পারে। প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে, টেলিফোন শুধু প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হয়।

টয়লেট/গোসলখানা– প্রত্যেক গৃহে এক বা একাধিক টয়লেট থাকতে পারে। তবে সাধারণত দেখা যায়, টয়লেটের সংখ্যার তুলনায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি থাকে। তাই টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রয়োজন বুঝে ব্যবহার করতে হবে। যার জোরে অফিসে বা স্কুল-কলেজে যেতে হয়, তাকে টয়লেট ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় যেন কেউ টয়লেট আটকিয়ে না রাখে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। নিয়মিত টয়লেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। টয়লেটের মেঝে সব সময় শুকনা রাখতে হবে, যাতে পিচ্ছিল না হয়ে যায়। নিয়মিত পরিষ্কারক ও জীবাণুনাশক দ্রব্য ব্যবহার করে টয়লেট জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

কলতলা– একটি কল বাড়ির বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করতে হয়। যেমন–তৈজসপত্র, কাপড়, শাকসবজি ইত্যাদি ধোয়া এবং রান্নার জন্য পানি নেওয়া ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে সবাইকে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। কলের ঠিক নিচে বসে কাজ না করে, প্রত্যেকে পানি নিয়ে আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করলে কাজের সুবিধা হয়। অযথা কল ছেড়ে না রেখে কাজ শেষ করে ভালোভাবে কল বন্ধ করতে হবে যাতে পানির অপচয় না হয়। কাজের সুবিধার জন্য কলতলা সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

কুয়ার পানি– গ্রামাঞ্চলে জায়গা বিশেষে কুয়া দেখা যায়। কুয়া থেকে সবাই যেন পানি নিতে পারে, সে সুবিধা থাকতে হবে। অকারণে বালতি আটকে রেখে অন্যের বিরক্তির উদ্রেক করা ঠিক নয়। পানি তোলা শেষ হলে বালতি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে কুয়া ঢেকে রাখতে হবে। কুয়ার চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের।

আঙিনা– বাড়িতে আঙিনা থাকলে, অনেকে বিকালে এখানে এসে গল্প করে, বাগান করে। আঙিনা যেন পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে বাড়ির সকলকেই যত্নবান হতে হয়। গাছের ঝরাপাতা, আগাছা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে হবে। গৃহের ভিতরের মতো এর আঙিনা পরিষ্কার রাখলে সবার শরীর ও মন ভালো থাকবে।

কাজ–১ তোমার পরিবারের যৌথ সম্পদগুলো শনাক্ত করো।

কাজ–২ তোমার ঘরের বাতি ও বৈদ্যুতিক পাখা তুমি কীভাবে ব্যবহার করবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মানবীয় সম্পদ?

ক. অর্থ খ. পার্ক

গ. শক্তি ঘ. গয়না

২. শক্তির অপচয় রোধ করা যায়–

i. স্বাধীনভাবে কাজ করলে

ii. সরঞ্জাম হাতের নাগালে রাখলে

iii. একই ধরনের কাজ পাশাপাশি করলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৮ম শ্রেণির ছাত্রী সুমিতা লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারকে সাহায্য করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শেখে। নিজের তৈরি বিভিন্ন নকশা সামগ্রী ব্যবহার করে ঘরকে সাজায়।

৩. সুমিতার মাঝে কোন ধরনের সম্পদের প্রভাব দেখা যায়?

ক. অর্থ খ. গৃহের সরঞ্জাম

গ. সদিচ্ছা ঘ. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

৪. উক্ত সম্পদ ব্যবহারে পরিবারের কোন ধরনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব–

i. আর্থিক

ii. সামাজিক

iii. শিক্ষামূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাশেদা ও সোনিয়া দুই বান্ধবী। দুজনই গৃহের সদস্যদের চাহিদা পূরণে সচেতন। রাশেদা আয় অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিকল্পনা করেন। পরিবারের আর্থিক কোনো সমস্যায় রাশেদাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না। অন্যদিকে সোনিয়াকে সদস্যদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। প্রায়ই মাসের শেষের দিকে তাকে পরিচিত একটি দোকান থেকে বাকিতে চাল কিনতে হয়। হঠাৎ ২/৩ দিন আগে সোনিয়ার ছোট ছেলে অপু অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য রাশেদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি ছেলের চিকিৎসা করেন।

ক. কোন সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়?

খ. মানবীয় সম্পদ কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকে সোনিয়ার এই পরিস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে রাশেদা ও সোনিয়ার পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করো।

২. শুভ ও নেলী দুই ভাইবোন। শুভ তার শোবার ঘরে বসে পড়ছে। আর নেলী বসার ঘরে বসে পড়াশোনা করছে। বিষয়টি দেখে মা নেলীকে শুভর ঘরে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। বড় ঘরটিতে একটি মাত্র ফ্যান থাকায় নেলী বাতাস পাচ্ছিল না। ফলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নেলী ঘেমে উঠে। শুভ বিষয়টি দেখে বোন নেলীকে ফ্যানের বাতাস পাওয়া যায় এমন জায়গায় গিয়ে বসতে বলে।

ক. গৃহ সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

খ. "শক্তির" যথাযথ ব্যবহার বলতে কী বোঝায়?

গ. শুভ ও নেলীকে একই ঘরে পড়তে দেওয়ার মাধ্যমে মা তার পরিবারের কোন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করলেন– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শুভ ও নেলীর মধ্যে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক।"– তুমি কি এ বিষয়ে একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা

পাঠ ১ – গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা

গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয় – গৃহের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, নিরাপদে চলাফেরা, আরাম ও বিশ্রামের জন্য গৃহ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি থাকা প্রয়োজন। গৃহে এরকম পরিবেশ বজায় রাখলে গৃহ নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। গৃহ পরিবেশ যদি নিরাপদ না থাকে তবে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয়–

- আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা, যাতে ঘরের মধ্যে চলাফেরায় কোনো অসুবিধা না হয়।
- কোনো আসবাবপত্র ভেঙে গেলে সেটা সরিয়ে ফেলা বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করা।
- গৃহে চলাচলের জায়গায়, সিঁড়িতে, রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা।
- সিঁড়িতে, ছাদের চারপাশে রেলিংয়ের ব্যবস্থা রাখা।
- বাথরুম, রান্নাঘর, কলপাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মেঝে যাতে পিচ্ছিল না থাকে সেজন্য ঝাড়ু বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে শ্যাওলা বা পিচ্ছিল পদার্থ দূর করা।
- মেঝেতে কাচের টুকরা, পিন, সুচ ইত্যাদি পড়লে সাথে সাথে তা তুলে ফেলা।
- ঘরের মেঝেতে পানি পড়লে সাথে সাথে মুছে ফেলা।
- ছুড়ি, কাঁচি, বটি, দা, নেইল কাটার, নিড়ানী, কোদাল ইত্যাদি সরঞ্জাম কাজ শেষে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা।
- রান্নাঘরের ময়লা-আবর্জনা ডাস্টবিন বা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।
- বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেলে, সুইচ ভেঙে গেলে সাথে সাথে তা মেরামত করা।
- বৈদ্যুতিক তার, সুইচ ইত্যাদিতে ছোট শিশুরা যাতে হাত দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা।
- রান্না শেষে চুলা নিভিয়ে ফেলা।
- ওষুধ, কীটনাশক, সার ইত্যাদি ছোট শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা।
- নর্দমা বা ড্রেন, ম্যানহোলে ঢাকনা ব্যবহার করা।

পরিবারের সকলের সচেতনতা ও সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে গৃহ পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। গৃহ পরিবেশের নিরাপত্তা পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে আসে।

প্রাথমিক চিকিৎসা – বাড়িতে, স্কুলে বা খেলার মাঠে হঠাৎ কারও কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ অসুস্থ হলে তাকে আরাম দেওয়ার জন্য তোমরা কি কোনো ব্যবস্থা নিতে পার? প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে এরকম অবস্থায় আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে আরাম দেওয়া যায়। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। হঠাৎ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে, আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা বা তাকে সাময়িকভাবে আরাম দেওয়ার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা।

উদ্দেশ্য –

- আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা, যাতে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে না যায়; যেমন – রক্ত পড়তে থাকলে তা বন্ধের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা, নাড়ির গতি দেখা ইত্যাদি।
- আহত ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি করে সাময়িক আরাম দেওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি –

গৃহে ছোট ছোট দুর্ঘটনা মোকাবিলা অথবা অসুস্থ রোগীর সেবায় প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জামাদি রাখা খুবই জরুরি। সরঞ্জামাদির তালিকা – গজ, তুলা, ব্যান্ডেজ, সরু ধারালো ছুরি, কাঁচি, ডেটল/স্যাভলন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, কার্বলিক এসিড, স্পিরিট, ব্যথানাশক ওষুধ ইত্যাদি। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি একটি বাক্সে ভরে নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে, প্রয়োজনের সময় যাতে সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি যে বাক্সে রাখা হয় তাকে ফার্স্ট এইড বক্স বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি

> **কাজ** – তোমার পরিবারের জন্য একটি ফার্স্ট এইড বক্স তৈরি করো।

পাঠ ২ – বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা ছোট বা বড় যেকোনো ধরনের হতে পারে। প্রথমে আমরা ছোট দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানব।

ছোট দুর্ঘটনা – যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটলে মারাত্মক আকার ধারণ করে না, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সহজেই

সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় সেগুলো ছোট দুর্ঘটনা। যেমন-

১। **ছোট আঘাত** – মাংসপেশিতে চাপ লাগা, নখ কাটতে গিয়ে দেবে যাওয়া, চোখে কিছু পড়া, হাতে গরম ভাপ লাগা ইত্যাদি ছোট আঘাত হিসাবে ধরা হয়। এক্ষেত্রে যা করণীয়–

- মাংসপেশিতে, আঙুলে চাপ লাগলে সেই স্থান নীল হয়ে যায়, তাই চাপ লাগার সাথে সাথে একখণ্ড বরফ কাপড়ে পেঁচিয়ে ধরতে হবে বা ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে।
- নখের কোণা দেবে গেলে, জীবাণুনাশক ক্রিম বা স্যাভলন দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।
- চোখে কিছু পড়লে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে।
- রান্নার সময় গরম ভাপ লাগলে বরফ, ঠান্ডা পানি, লবণ পানি, নারকেল তেল বা টুথপেস্ট আক্রান্ত স্থানে লাগাতে হবে।

২। **কেটে যাওয়া** – দা, ছুরি, বটি, ব্লেড দিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক সময় হাত বা পা কেটে যায়। কেটে গেলে যা করণীয়-

- কাটা স্থানে ময়লা থাকলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে, কাপড় দিয়ে চাপ দিয়ে ধরতে হবে এবং উঁচু করে রাখতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়।
- জীবাণুনাশক ওষুধ যেমন– স্যাভলন, ডেটল, নেভানল ক্রিম ইত্যাদি লাগিয়ে গজ বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।
- ক্ষত বেশি হলে প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৩। **কীটপতঙ্গের দংশন** – বোলতা, মৌমাছি, পিঁপড়া, ভিমরুল ইত্যাদি কামড়ালে বা হুল ফুটালে যা করণীয় –

- সুচের আগা আগুনে পুড়িয়ে স্যাভলন দিয়ে মুছে জীবাণুমুক্ত করে হুল তুলে আনতে হবে।
- মৌমাছি, পিঁপড়া কামড়ালে পিঁয়াজের রস বা লেবুর রস ঘসে লাগাতে হবে।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৪। **কাঁটা ফুটে যাওয়া**–হাতে-পায়ে কোথাও কাঁটা ফুটলে অথবা কাঠ বা বাঁশের শাল ঢুকলে যা করণীয় –

- কাঁটা বা শালের অংশ যদি দেখা যায় তবে চিমটা দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- যদি না দেখা যায় তবে সুচ আগুনে পুড়িয়ে জীবাণু মুক্ত করে কাঁটাযুক্ত স্থানের চামড়া সুচ দিয়ে সরিয়ে শাল বা কাঁটা বের করে আনতে হবে, এরপর স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

শাল বা কাঁটা বের করা হচ্ছে

৫। **গলায় কিছু আটকে যাওয়া** – অনেক সময় মাছের কাঁটা, হাড়ের টুকরা গলায় আটকে যায়। ফলে ঢোক গিললে গলায় ব্যথা লাগে, অস্বস্তি বোধ হয়। এই ক্ষেত্রে যা করণীয়–

- অনেক সময় শুকনা ভাত মুঠা করে না চিবিয়ে গিলে খেলে কাঁটা নেমে যায়।
- পাকা কলা খেলেও কাঁটা নেমে যায়।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৬। **চোখে কিছু পড়া**– ধুলাবালি, চোখের পাপড়ি চোখের ভিতরে ঢুকে গেলে কোনোক্রমেই চোখে হাত দেওয়া উচিত নয়। ঘষা লাগলে চোখ জ্বালা করবে। চোখের অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই যা করতে হবে–

- চোখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে, এতে আরাম বোধ হবে।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৭। **কানে কিছু ঢুকে যাওয়া** – কানে পিঁপড়া বা পোকা ঢুকে গেলে খুবই অস্বস্তি লাগে। এক্ষেত্রে যা করণীয়–

- কিছু সময় শ্বাস বন্ধ করে রাখলে পিঁপড়া বা পোকা বেরিয়ে আসবে।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পাঠ ৩– বড় দুর্ঘটনা (অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কাটা)

বড় দুর্ঘটনায় মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়, মৃত্যুঝুঁকি থাকে। এইসব দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা ক্ষতির হাত থেকে আহত ব্যক্তিকে রক্ষা করে সাময়িক আরাম দিতে পারে। তাই বড় দুর্ঘটনা সম্পর্কে সকলের ধারণা থাকা দরকার। বড় দুর্ঘটনাগুলো হচ্ছে–অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কাটা, হাড় ফাটা ও ভেঙে যাওয়া, পানিতে ডোবা, তড়িতাহত ইত্যাদি।

বড় দুর্ঘটনাগুলোতে করণীয়–

১। **অজ্ঞান হওয়া** – অত্যধিক গরম, ক্ষুধা, ভয়, দুর্বলতা, দুঃসংবাদ ইত্যাদি কারণে মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ কমে যায়, ফলে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেউ অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে যা করতে হবে তা হচ্ছে–

- অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে চিত করে শুইয়ে দিতে হবে এবং মস্তিষ্কে অধিকতর রক্ত সরবরাহের জন্য পা উঁচু করে রাখতে হবে, শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ির স্পন্দন লক্ষ করতে হবে।

অজ্ঞান ব্যক্তির পরিচর্যা

- মানুষের ভিড় কমিয়ে মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শরীরের কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে।
- রোগীর দাঁতে দাঁত যাতে লেগে না যায়, সেজন্য রুমাল ভাঁজ করে দুই পাটি দাঁতের মাঝে দিতে হবে।
- চোখে, মুখে পানির ঝাপটা দিতে হবে।
- হাত ও পায়ের তালু ম্যাসেজ করতে হবে।
- জ্ঞান ফিরলে গরম দুধ বা শরবত খাওয়াতে হবে।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

২। **আগুনে পোড়া** – অনেক সময় পরিধেয় বস্ত্রে আগুন ধরে যায়। গরম পানি, তেল, গরম দুধ ইত্যাদি শরীরে পড়ে শরীর ঝলসে যায়। এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হচ্ছে –

- পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগলে তা খুলে ফেলতে হবে।
- কাপড় খুলতে না পারলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভাতে হবে।
- ভারী কাঁথা, মোটা চট বা চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে ধরলে আগুন নিভে যায়।
- ক্ষত স্থানে ঠান্ডা পানি বা বরফ দিলে ফোসকা পড়বে না। পোড়া জায়গায় কমপক্ষে ১০-১৫ মিনিট পানি ঢালতে হবে। ফোসকা পড়ে গেলে কোনোক্রমেই সেটা গলানো যাবে না।
- প্রচুর পানি খেতে হবে এবং চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

কাজ – ১ তোমার কোনো সহপাঠী ক্লাসে অজ্ঞান হয়ে গেলে তোমার করণীয় পোস্টার পেপারে লেখো।

৩। **সাপে কাটা** – আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলে যেখানে ঝোপ-জঙ্গল থাকে, সেখানে সাপ থাকার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। সে সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তবে রাস্তাঘাটে বা হাঁটাচলার পথে সাপ আক্রমণ করতে পারে। সাপে কাটলে প্রথমে লক্ষ করতে হবে সাপটি বিষধর কি না। সাপ কামড়ালে যদি দুটি দাঁতের চিহ্ন - '৪' থাকে তবে বুঝতে হবে সাপটি বিষধর। আর যদি চারটি দাঁতের চিহ্ন - '৪৪' থাকে তবে বুঝতে হবে সাপটি বিষধর নয়।

বিষধর সাপ কামড়ালে যা করণীয়–

- সাপে কাটার সাথে সাথে বিষ রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তাই আক্রান্ত স্থানের উপরে ও নিচে দুইটি বাঁধন দিতে হবে।
- ধারালো ব্লেড বা ছুরি আগুনে পুড়িয়ে, ডেটল বা স্যাভলন দিয়ে মুছে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- দংশিত স্থান হাফ ইঞ্চি বা এক সেন্টিমিটার গভীর করে কেটে চাপ দিয়ে রক্ত বের করে ফেলতে হবে।
- বাঁধন কোনোক্রমেই ৩০ মিনিটের বেশি রাখা যাবে না, কারণ এতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে বাঁধনের নিচের অংশে পচন ধরতে পারে।

সাপে কাটায় বাঁধন দেয়া

- দংশিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে, তাকে গরম দুধ বা চা খাওয়াতে হবে।
- দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।
- সাপটি যদি বিষধর না হয় তবে আক্রান্ত স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

পাঠ ৪ – হাড় ফাটা ও ভেঙে যাওয়া, পানিতে ডোবা, তড়িতাহত

১। **হাড় ফাটা ও ভেঙে যাওয়া** – পড়ে গিয়ে বা কোনো দুর্ঘটনায় শরীরের যেকোনো অংশের হাড় ফেটে বা ভেঙে যেতে পারে। এতে আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় ছটফট করে। এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে–

- যে স্থানের হাড় ফেটেছে বা ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে সেই স্থানটি খুব সাবধানে বাঁশের চটা বা কাঠের তক্তা বা বোর্ডের উপর রেখে হাল্কাভাবে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

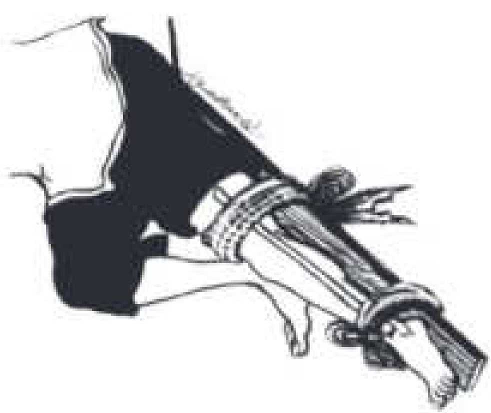

হাড় ভেঙে যাওয়ায় করণীয়

- কোনোক্রমেই হাড় সোজা করার চেষ্টা করা যাবে না।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

২। **পানিতে ডোবা** – কেউ পানিতে ডুবে গেলে তাকে পানি থেকে তোলার জন্য নিজে কখনো পানিতে নামবে না। যা করতে হবে তা হচ্ছে –

- চিৎকার করে বড়দের সাহায্য চাইতে হবে।
- ভেসে থাকা যায় এমন কিছু যেমন–বাঁশ, গাছের ডালপালা, খালি হাড়ি, কলস, তক্তা ইত্যাদি ছুড়ে দিতে হবে।
- বড়দের সাহায্য নিয়ে বড় বাঁশ, গাছের ডাল দিয়ে তাকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করতে হবে।
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানি থেকে তুলে এনে শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ির স্পন্দন লক্ষ করতে হবে। কেননা পানিতে ডুবে গেলে নাক-মুখ দিয়ে পানি ঢুকে শ্বাসনালি ও ফুসফুসে চলে যায় ফলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- যদি দেখা যায় নিঃশ্বাস পড়ছে না তাহলে মাথা নিচু ও কাত করে শুইয়ে দিতে হবে, মুখের চোয়াল দুই পাশ থেকে শক্ত করে ধরে মুখ হাঁ করে শ্বাসনালি খুলে দেওয়ার জন্য দুটি আঙুলে পরিষ্কার কাপড় পেঁচিয়ে মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে পেট ও বুকে চাপ দিতে হবে। এতে ভিতরের পানি গলা দিয়ে বের হয়ে আসবে। অতপর চিত্রের মতো কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালুর চেষ্টা করতে হবে।

কৃত্রিমভাবে শ্বাসক্রিয়া চালানো হচ্ছে

- দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৩। **তড়িতাহত** – আমরা অনেক সময় অসাবধানতা বা অজ্ঞতার কারণে তড়িতাহত বা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হই। তড়িতাহত বা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলে কোনোক্রমেই তাকে খালি হাতে স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করলে তুমিও বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হবে। অনেক সময় ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকলে সে তারের সংস্পর্শে আসলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হতে হয়। কেউ তড়িতাহত হলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বা গৃহের ভাঙা সুইচে হাত দিলেও বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এক্ষেত্রে যা করতে হবে তা হচ্ছে—

- তড়িতাহত হওয়ার সাথে সাথে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে।
- কোনো কারণে সুইচ বন্ধ করতে না পারলে শুকনা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তড়িতাহতকে ধাক্কা দিতে হবে।
- হাতে রাবারের দস্তানা, পায়ে রাবারের স্যান্ডেল পরে তড়িতাহতকে উদ্ধার করতে হবে।
- শ্বাসক্রিয়া চলছে কি না তা দেখে মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হবে।

তড়িতাহতকে রক্ষা

- কাঠের উপর শুইয়ে দিয়ে মালিশ করে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

কাজ – তড়িতাহত হলে কী করতে হবে তা দলগতভাবে অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীবাণুনাশক দ্রব্য কোনটি?

ক. গজ
খ. স্টিকিং
গ. স্পিরিট
ঘ. ব্যান্ডেজ

২. পরিবারের উদ্দেশ্যই হলো সদস্যদের–

i. চাহিদা পূরণ
ii. লক্ষ্য অর্জন
iii. নিরাপত্তা দান

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গ্রীষ্মের সকালে রানা সুস্থ শরীরে খাওয়াদাওয়া করে স্কুলে আসে। বিদ্যালয়ে দুই ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ নেই। ব্যবহারিক ক্লাস করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায় রানা। ক্লাসের অন্য ছাত্ররা এসে ভিড় জমায়। রানার বন্ধু রনি ছাত্রদের ভিড় করতে বারণ করে।

৩. রানার অজ্ঞান হওয়ার কারণ কী?

ক. ক্ষুধা খ. গরম

গ. জ্বর ঘ. ভয়

৪. রানার জন্য রনির করণীয়-

i. চিত করে শুইয়ে দেওয়া

ii. বাতাসের ব্যবস্থা করা

iii. চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রোকসানা বেগমের গৃহে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। গত মাসে রোকসানা বেগমের ছোট ছেলে জাওয়াদ বাথরুমে পিছলে পড়ে হাত ভেঙে ফেলে। এছাড়া একদিন আগে মেঝেতে পড়ে থাকা ব্লেড দিয়ে তার মেয়ে মিতুর পা কেটে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়। মা হাতের কাছে থাকা জীবাণুনাশক দ্রব্য এবং পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে মা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. গৃহের কোন পরিবেশ ক্লান্তি দূর করে?

খ. "গৃহ আমাদের স্বস্তির স্থল"— বুঝিয়ে লেখো।

গ. মিতুর দুর্ঘটনায় মায়ের গৃহীত ব্যবস্থাটি কী নামে পরিচিত? তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রোকসানার গৃহ পরিবেশ নিরাপদ কী? বিশ্লেষণ করো।

২.

রাতুলের বন্ধু তকীরের পায়ে সাপ কামড় দেয়। রাতুল চিত্রের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করে। কিছুসময় যাওয়ার পর এক প্রবীণ ব্যক্তি বলে উঠে পায়ের এই বাঁধন ৩০ মিনিটের বেশি রাখা ঠিক নয়। এতে বাঁধনের অংশে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিষয়টা বুঝতে পেরে রাতুল ও তার বন্ধুরা মিলিত হয়ে তকীরের পায়ের যথাযথ ব্যবস্থা করে।

ক. প্রাথমিক চিকিৎসা কী?

খ. আগুনে পুড়ে গেলে ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখো।

গ. তকীর শুশ্রূষায় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. চিত্রের আক্রান্ত স্থানের উপর বাঁধন দেওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহে রোগীর শুশ্রূষা

পাঠ ১– রোগীর কক্ষের সাজসরঞ্জাম ও পরিচ্ছন্নতা

স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে কখনো কখনো আমরা নানারকম রোগে আক্রান্ত হই। বেশিরভাগ রোগে আমরা চিকিৎসার পাশাপাশি গৃহে যথাযথ শুশ্রূষার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করি। সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বর থেকে শুরু করে বিভিন্নরকম সংক্রামক রোগ যেমন– হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগেও আমরা আক্রান্ত হই। পরিবারের যেকোনো সদস্য রোগাক্রান্ত হলে, তার বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া দরকার। অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক দুর্বলতার কারণে যথাযথ যত্নের দরকার হয়। তাকে আরাম ও বিশ্রাম দেওয়ার জন্য কোলাহলমুক্ত, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা দরকার। আর সে কারণেই রোগীর জন্য আলো-বাতাসপূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্মত একটা কক্ষের প্রয়োজন হয়। রোগীকে নির্দিষ্ট কক্ষে রেখে তার উপযুক্ত শুশ্রূষা করতে পারলে, যে কোনো রোগ থেকেই সে সহজে এবং তাড়াতাড়ি নিরাময় পেতে পারে।

রোগীর কক্ষের সাজসরঞ্জাম

রোগীর কক্ষটি খোলামেলা ও ছিমছাম হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব ও সাজসরঞ্জাম রোগীর কক্ষে রাখা উচিত না। শুধু রোগীর উপযুক্ত পরিচর্যার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হয়, যাতে সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। রোগীর কক্ষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম হলো–

- ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার
- ওষুধ মাপার কাপ ও চামচ
- ফিডিং কাপ, গ্লাস, প্লেট, জগ
- বেডপ্যান, ইউরিনাল
- গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যাগ
- সেকেন্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি, কলিং বেল, টর্চলাইট
- রুম হিটার ও ওয়াটার হিটার
- প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স
- বালতি, মগ ইত্যাদি

রোগীর কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রোগীর কক্ষের ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথমে কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কক্ষের আসবাবপত্র, রোগীর পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, বালিশ, চাদর সবকিছুই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা দরকার।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকলে সহজে রোগ নিরাময় হয়। অন্যদিকে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ রোগীর জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।

রোগীর ঘর প্রতিদিন ফিনাইল বা ডেটল পানি দিয়ে ভালো করে মুছতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত প্লেট, গ্লাস, বেডপ্যান ইত্যাদি সরঞ্জাম প্রতিদিন সাবান, গরমপানি দিয়ে ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে। কক্ষের দরজা ও জানালায় সাদা বা হালকা রঙের পর্দা ব্যবহার করলে ভালো হয়। পর্দা ব্যবহারে ধুলাবালি ও কড়া রোদ কক্ষে প্রবেশ করতে পারে না। রোগীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদগুলো প্রতিদিন সাবান ও গরম পানিতে ধুয়ে রোদে শুকাতে হয়। এছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের কভার, মশারি, তোয়ালে বা গামছা, রুমাল ইত্যাদি প্রতিদিন ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। দরজা ও জানালার গ্রিল ডেটল পানি দিয়ে মুছতে হবে। রোগীর ব্যবহারের লেপ, তোষক, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য মাঝে মাঝে কড়া রোদে দিতে হবে। রোগীর মলমূত্রাদি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

রোগীর কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম, টয়লেট প্রতিদিন ফিনাইল, ভিম, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হয়। কক্ষের মেঝে কাঁচা হলে, সেখানে পানি পড়লে সাথে সাথে লেপে দিতে হবে। এছাড়াও কয়েকদিন পর পর পুরা মেঝে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে। ছাদ ও দেয়াল টিন বা বেড়ার তৈরি হলে, ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে।

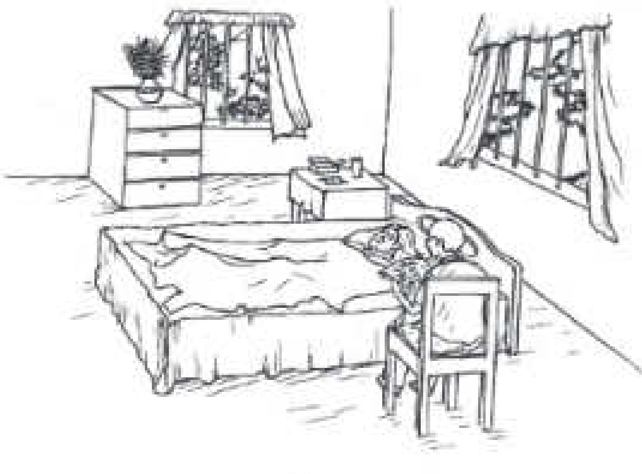

রোগীর কক্ষ

রোগীর কক্ষে যেন মশা-মাছির উপদ্রব না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর কক্ষের পরিবেশ ভালো হলে, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠা রোগীর জন্য সহায়ক হয়। সেজন্যই রোগীর কক্ষটা যেমন আরামদায়ক হতে হবে, তেমনি বিভিন্নরকম দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

কাজ– ১ জ্বরে আক্রান্ত রোগীর জন্য কী কী সরঞ্জামের প্রয়োজন তার একটা তালিকা করো।

কাজ– ২ কীভাবে রোগীর কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যায়, সে সম্বন্ধে লেখো।

পাঠ ২– রোগীর পরিচর্যা

যেকোনো রোগীর জন্য তার পরিচর্যার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। আবার পরিচর্যার অভাবে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। সেজন্য পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার পরিচর্যার ব্যাপারে সচেতন ও যত্নবান হতে হবে। রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের শরীর ও মন দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় সে নিজের কাজটাও নিজে করতে পারে না। তাই এসময় পরিবারের অন্য সদস্যদের রোগীর পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে হয়। রোগীর প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে সহানুভূতির সাথে তার পরিচর্যা করতে হয়।

রোগীর পরিচর্যার মধ্যে যে বিষয়গুলো পড়ে তা হলো–

- শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়
- নাড়ির গতি নির্ণয়
- শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয়

শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়– সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দেহের তাপমাত্রা থাকে ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু জ্বর বা যেকোনো রোগে আক্রান্ত হলে দিনের বিভিন্ন সময়ে এ তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়ে যায়। তাপমাত্রার এই পরিবর্তনের হার বা মাত্রাটা যদি রেকর্ড করে রাখা যায়, তাহলে চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নির্ণয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া সহজ হয়।

শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য একটি ক্লিনিক্যাল বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার দরকার হয়। থার্মোমিটার একটি লম্বা ও সরু গোলাকার কাচের নল। থার্মোমিটারের গায়ে ৯৪ ডিগ্রি থেকে ১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। থার্মোমিটারের মাঝখানে সরু ছিদ্র থাকে। আর নলের একপাশে ছোট একটা বাল্ব পারদপূর্ণ থাকে। তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটারটি বগলের নিচে বা মুখের ভিতরে জিহ্বার নিচে রাখা হয়। দেহের তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে পারদ আয়তনে বেড়ে যায় এবং ক্রমশ উপরের দিকে অগ্রসর হয়। যেখানে উঠে পারদ স্থির হয়ে যায়, সেটাই শরীরের তাপমাত্রা নির্দেশ করে। তাপমাত্রা দেখা হয়ে গেলে তার রেকর্ড রেখে, পারদপূর্ণ স্থানের বিপরীত দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে পারদ যথাস্থানে নামিয়ে আনতে হয়। তাপমাত্রা নির্ণয়ের সময় লক্ষণীয় বিষয়–

- থার্মোমিটারের পারদ ৯৪ ডিগ্রিতে আনা
- সাধারণত বগলে বা মুখে থার্মোমিটার স্থাপন করা
- নির্দিষ্ট স্থানে থার্মোমিটার ২ মিনিট রেখে তাপমাত্রা জানা
- শুশ্রূষাকারীর মাধ্যমে রোগীর দেহের তাপ নেওয়া
- তাপ নেওয়ার পর দেহের তাপমাত্রা দৈনিক চার্টে লিখে রাখা

ফর্মা-৪

তাপমাত্রা রেকর্ড রাখার নিয়ম– পাশের ছক অনুযায়ী কাগজ তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ে তাপমাত্রা নির্ণয় করে তা লিখে রাখতে হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী দিনে কয়েকবার এ তাপমাত্রা মাপা হয়। এর সাথে একই সময়ে নাড়ির গতি ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা জেনে লিখে রাখা হয়।

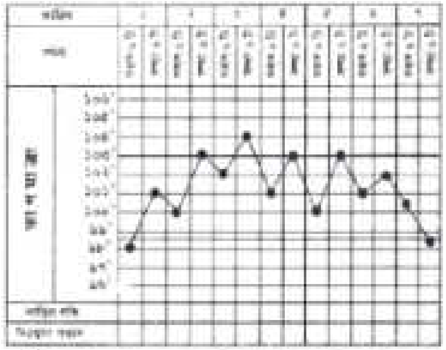

শরীরের তাপমাত্রা, নাড়ির গতি ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা লিপিবদ্ধ করার ছক

নাড়ির গতি

আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের তালে তালে রক্তবাহী ধমনিগুলো নিয়মিতভাবে স্ফীত হয়। ধমনির এই স্ফীতির হারকে নাড়ির গতি বলা হয়। সাধারণত হাতের কব্জিতে আঙুল রেখে, স্পষ্টভাবে নাড়ির গতি অনুভব করা যায়। নাড়ির গতি নির্ণয়ের সময় একটি সেকেন্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি থাকা আবশ্যক। নাড়ির গতি দেখার সময় রোগীর হাত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে রাখতে হয়। কব্জির যেখানে অবিরাম স্পন্দন হয়, সেই ধমনির উপর হাতের তিনটি আঙুলের প্রান্তভাগ দিয়ে হালকাভাবে চাপ দিলে ধমনির স্পন্দন অনুভব করা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিমিনিটে নাড়ির স্পন্দন হয়ে থাকে–

• সদ্যজাত শিশুর ১৩০-১৪০ বার	• ৮-১৪ বছরের কিশোর-কিশোরীর ৮০-৯০ বার
• ১ বছর বয়স্ক শিশুর ১১০-১২০ বার	• প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ৬৫-৮০ বার
• ২ বছর বয়স্ক শিশুর ১০০-১১০ বার	• প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ৬০-৭২ বার

জ্বর হলে নাড়ির গতি বেড়ে যায়। এছাড়া ব্যায়াম, রক্তক্ষরণ, স্নায়বিক আঘাত কিংবা হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিকতায় নাড়ির গতি বেড়ে যায়। প্রতিমিনিটে যতবার ধমনি স্পন্দিত হয়, সেই সংখ্যাই নাড়ির গতির হার নির্দেশ করে। নাড়ির গতির হার খুব মনোযোগ দিয়ে গণনা করে, তার তালিকা করে রাখতে হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী দিনে কয়েকবার নাড়ির গতির হার রেকর্ড করা হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি – শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করতে হলেও সেকেন্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি দরকার। শ্বাসক্রিয়ার গতি জানতে হলে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বুক বা পেটের উঠানামার জায়গায় একটি হাত রেখে রোগীকে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে বলতে হবে। বুক বা পেট প্রতি এক মিনিটে কতবার উঠানামা করছে তা গণনা করে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করা হয়। চিকিৎসকের নির্দেশমতো সঠিক সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করে, তার রেকর্ড রাখা হয়।

তাপমাত্রা, নাড়ির গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির রেকর্ড বা তালিকা থেকে চিকিৎসক সঠিকভাবে রোগীর রোগের অবস্থা জানতে পারেন। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে তাড়াতাড়ি রোগের উপশম হতে পারে।

কাজ – ১ থার্মোমিটার দিয়ে তোমার নিজের ও পরিবারের সবার শরীরের তাপমাত্রা নিরূপণ করো।

কাজ – ২ সঠিক নিয়মে তোমার পাঁচজন বন্ধুর নাড়ির গতি নির্ণয় করো।

পাঠ ৩ – রোগীর শারীরিক ও মানসিক যত্ন

রোগীর সুস্থতার জন্য পরিচর্যার পাশাপাশি তার শারীরিক ও মানসিক যত্নের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। কারণ একজন সুস্থ ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় কাজগুলো, যেমন– গোসল করা, পোশাক পরা, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি নিজেই করতে পারে। কিন্তু অসুস্থ হলে এই কাজগুলোর জন্য শুশ্রূষাকারীর সাহায্যের দরকার হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে রোগীর যত্ন নেওয়া দরকার। দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য রোগীর শারীরিক ও মানসিক যত্ন নেওয়ার প্রতি পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

শারীরিক যত্ন

রোগীকে আরাম দেওয়ার জন্য তার শারীরিক যত্নের দরকার। অসুস্থতার সময় শারীরিকভাবে দুর্বল থাকার কারণে রোগীর যত্নের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। শারীরিক যত্নের বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা করা হলো–

পথ্য নির্বাচন ও পরিবেশন

অসুস্থ অবস্থায় রোগীর বিশেষ চাহিদা অনুসারে তাকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা পথ্য হিসেবে বিবেচিত। রোগের প্রকৃতি ও তীব্রতা, রোগীর বয়স ও রুচি, পরিপাক শক্তি ইত্যাদি বিবেচনা করে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমৃদ্ধ সুষম পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সব রোগে একরকম পথ্য দেওয়া যায় না। রোগবিশেষে কোনো কোনো বিশেষ পুষ্টি উপাদান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন– বেশি জ্বরে ভুগলে ক্যালরিবহুল সহজপাচ্য খাবার বেশি দিতে হবে।

শিশুর কোয়াশিয়রকর রোগে প্রোটিন বেশি খাওয়াতে হয়। আবার কিডনি রোগে প্রোটিনের পরিমাণ কমাতে হয়। ডায়াবেটিস রোগে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। উচ্চ রক্তচাপে লবণ ও হৃদরোগে চর্বিবহুল খাদ্য গ্রহণ ক্ষতিকর। ডায়রিয়া বা তীব্র জ্বরে ডাবের পানি, স্যালাইন, শরবত ইত্যাদি রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে।

রোগীর বয়স অনুযায়ী পথ্য নির্বাচন করতে হয়। শিশু ও বয়স্ক রোগীদের খাবার কম মসলা দিয়ে খুব নরম করে দিতে হবে, যাতে সহজে হজম করতে পারে। পথ্য নির্বাচনে রোগীর রুচির দিকেও বিশেষ নজর দিতে হয়। চিকিৎসকের সম্মতি নিয়ে রোগীর পছন্দ অনুযায়ী পথ্য দিলে তার তৃপ্তি বজায় থাকবে। মাঝে মাঝে খাবারের ধরনে পরিবর্তন আনলেও রোগীর খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সেজন্য খাদ্যে বৈচিত্র্য এনে খাবারের একঘেয়েমি দূর করা যায়, এতে রোগীর রুচিও বাড়ে। রোগীর পথ্য পরিবেশনেও যত্নবান হতে হবে। তাকে সব সময় সহজপাচ্য, টাটকা খাবার দিতে হবে। পথ্য যেন অধিক গরম বা ঠান্ডা না হয়, সেদিকে লক্ষ

রাখতে হবে। তার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে পথ্য পরিবেশন করতে হবে। একবারে বেশি খাবার না দিয়ে ভারী খাবারটা দিনের বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। যেভাবে খেলে রোগী আরাম পাবে, সেভাবে বসিয়ে বা শুইয়ে তাকে খাওয়াতে হবে। রোগী নিজ হাতে খেতে না পারলে শুশ্রূষাকারী তাকে সাহায্য করবে। বেশি দুর্বল রোগীকে অনেক সময় ফিডিং কাপ ও চামচের সাহায্যে খইয়ে দিতে হয়। খাওয়ার পর ভালোভাবে মুখ ধুয়ে বা রুমাল দিয়ে মুছে দিতে হবে।

ওষুধ সেবন

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে। ঔষধের পরিমাণ যেন ঠিক থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

রোগীর পোশাক-পরিচ্ছদ

রোগীকে নরম, হালকা রঙের সুতির পোশাক পরানো উচিত। পোশাক যেন ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। রোগীর পোশাক প্রতিদিন বদলে দিতে হবে এবং গরম পানি, সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে।

নিয়মিত দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠার পর এবং খাওয়ার পর দাঁত, মুখ পরিষ্কার করে দিতে হবে। রোগীকে প্রতিদিন গোসল করানো সম্ভব না হলে, গা স্পঞ্জ করে বা মুছে দিতে হবে। শোওয়া অবস্থায় মাথা ধোয়াতে হলে বালিশে রাবার ক্লথ এমনভাবে বিছিয়ে নিতে হবে যেন একপ্রান্ত পিঠের তলা পর্যন্ত আসে, অপর প্রান্ত খাটের পাশে রাখা বালতিতে পড়বে। মগ বা বদনার সাহায্যে ধীরে ধীরে মাথায় পানি ঢালতে হয়। এরপর শুকনা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে দিতে হয়। নিয়মিত রোগীর নখ কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। দিনে দুই থেকে তিন বার চুল আঁচড়াতে হবে। মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য প্রয়োজনে বেডপ্যান ব্যবহার করতে হবে। রোগীর ব্যবহারের পানি হালকা গরম হলে আরাম বোধ হবে।

রোগীর মানসিক যত্ন

শারীরিক যত্নের মতো রোগীর মানসিক যত্ন তাকে দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। রোগীর মন ভালো রাখার জন্য সেবাযত্নের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তার প্রতি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে রোগীর সব কষ্ট জেনে, তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। তাকে একা রাখা ঠিক নয়। তার সাথে কথা বলার জন্য পাশে কেউ থাকবে। তার মন ভালো রাখার জন্য, তার শখ অনুযায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। খোলা জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিলে তার মন প্রফুল্ল থাকবে। তার ঘর নিয়মিত সাজিয়ে রাখলে মনে প্রশান্তি আসবে। গুরুতর অসুস্থতায়ও তাকে সাহস জোগাতে হবে, যাতে তার মনোবল অটুট থাকে। রোগীর মানসিক যত্নের ব্যাপারে পরিবারের সবাইকে মনোযোগী হতে হবে।

কাজ–১ পরিবারের কোনো সদস্য জ্বরে আক্রান্ত হলে কীভাবে তুমি তার শারীরিক যত্ন নিতে পারো?
কাজ–২ রোগীর মানসিক যত্নের ব্যাপারে তুমি কী ভূমিকা রাখবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাভাবিক অবস্থায় কিশোর-কিশোরীর প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন হয়ে থাকে?

ক. ৬০-৭৫ বার খ. ৬৫-৮০ বার

গ. ৮০-৯০ বার ঘ. ৯০-১০০ বার

২. অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষায় পরিবেশ হতে হবে–

i. কোলাহলপূর্ণ

ii. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

iii. আলো-বাতাসপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তনু স্কুল থেকে ফেরার পথে বৈশাখী ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি আসে। বাড়ি এসে ঠান্ডা পানি পান করে। কিছুক্ষণ পর তনু কাশতে শুরু করে এবং তার সর্দি ও জ্বর দেখা দেয়। মা তনুর ছোট ভাই ধ্রুবকে তনুর ব্যবহৃত রুমাল ধরতে নিষেধ করেন।

৩. ধ্রুবকে তনুর ব্যবহৃত রুমাল ধরতে মানা করার কারণ রোগটি–

i. সংক্রামক

ii. বংশগত

iii. বায়ুবাহিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত রোগীর জন্য করণীয়–

ক. নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সপ্তাহে একবার ধোয়া খ. ব্যবহৃত পোশাক অল্প রোদে শুকানো

গ. দরজা, জানালায় পর্দা ব্যবহার না করা ঘ. ব্যবহৃত সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা

সৃজনশীল প্রশ্ন

দুই সপ্তাহ ধরে মুন্না জ্বরে ভুগছে। জ্বর কখনো থাকে আবার থাকে না। মা ছেলের মাথা ধুয়ে দেন ও গা স্পঞ্জ করেন। এতেও জ্বর না কমায় মা চিন্তিত হয়ে ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার সব শুনে মুন্নার দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার রেকর্ড করতে বলেন এবং পথ্যের ব্যাপারে সচেতন হতে বলেন। মুন্না তেমন কিছুই খায় না। মা ছেলেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যালরি বহুল, সহজপাচ্য ও টাটকা খাবার তৈরি করে বারবার খেতে দেন।

ক. সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দেহের তাপমাত্রা কত?

খ. জ্বর মাপার জন্য কোন ধরনের থার্মোমিটার প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখো।

গ. ডাক্তার কেন মুন্নার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার রেকর্ড করতে বলেন– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মায়ের দেওয়া পথ্য পরিবেশন মুন্নার সুস্থতার জন্য যথার্থ কি না – তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

খ বিভাগ

শিশুবিকাশ ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন অতি দ্রুত সংগঠিত হয়। অনেক সময় পূর্ব প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারণার অভাবে এ সময়ের বিকাশ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। নিজেকে রক্ষা করা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি যেমন– মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ করা ছেলেমেয়েদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুর সাধারণ রোগব্যাধি সংক্রমণমুক্তকরণ, টিকা ও ইনজেকশনের প্রয়োজনীয়তা জানা প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের আশপাশে বসবাসকারী বিভিন্ন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু আমরা দেখতে পাই, যাদের সম্পর্কে সচেতন হওয়াও আমাদের দায়িত্ব।

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- শিশুর সাধারণ রোগ-ব্যাধিগুলোর লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন রোগের সংক্রমণমুক্তকরণ টিকা, ইনজেকশনের বর্ণনা দিতে পারব;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বৈশিষ্ট্য ও তাদের প্রতি করণীয় আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বন্ধু নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় এবং প্রচার মাধ্যমের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করতে পারব।

চতুর্থ অধ্যায়

রোগ সম্পর্কে সতর্কতা

আমাদের চারপাশে নানা ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ঘুরে বেড়ায়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এর মধ্যে কতকগুলো জীবাণু ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্য, শ্বাস গ্রহণ, এবং চামড়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। তবে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেই আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ি না। কারণ জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের শরীরে নানারকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যদি শক্তিশালী না হয় তবে জীবাণু জয়ী হয়, আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমরা জ্বর, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া ইত্যাদি নানা রোগে আক্রান্ত হই। তাই বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সতর্কতা এবং সংক্রমণমুক্তকরণ টিকা ও ইনজেকশন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পাঠ ১ – শিশুর সাধারণ রোগব্যাধি

সঠিক যত্নের অভাবে অতি শৈশবে শিশুরা নানা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যে সকল কারণে শিশুরা সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সেগুলো হচ্ছে –

- জন্মের সময় ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজন
- নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ
- শিশু মাতৃগর্ভে থাকার সময় মায়ের অসুস্থতা বা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের অভাব
- জন্মের পরই শিশুকে মায়ের প্রথম দুধ বা শালদুধ না খাওয়ানো

- জন্মের ছয় মাস পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার বা পরিপূরক খাবার না দেওয়া
- সময়মতো রোগ প্রতিরোধক টিকা বা ইনজেকশন না দেওয়া

উপর্যুক্ত কারণে শিশুরা শারীরিকভাবে দুর্বল থাকে, ফলে সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। শিশুরা যে সকল সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সেগুলো আলোচনা করা হলো–

জ্বর – জ্বর সম্পর্কে সকলেরই নিশ্চয় ধারণা আছে। আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে ৯৮.৪° ফারেনহাইট। তবে ছোট শিশুদের দেহের তাপমাত্রা থাকে ৯৯° ফারেনহাইট। তাপমাত্রা যদি এর চেয়ে বৃদ্ধি পায় তবেই জ্বর বলে ধরা হয়। জ্বর নানা কারণে হতে পারে। যেমন– ইনফেকশন, অ্যালার্জি ইত্যাদি।

অল্প জ্বর হলে যা করণীয় –

- পাতলা সুতির জামা পরিধান করা
- আলো বাতাসপূর্ণ ঘরে থাকা
- মাথা ধুয়ে শরীর ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা
- স্যালাইন, ফলের রস, শরবত, সুপ, পাতলা দুধ ইত্যাদি তরল খাবার বেশি করে খাওয়া
- চিকিৎসকের পরামর্শমতো চলা

কাজ – দেহের তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক বেড়ে গেলে তোমার করণীয় বর্ণনা করো।

উচ্চ জ্বর হলে করণীয় – ১-৫ বছরের শিশুর মধ্যে উচ্চ জ্বরের প্রবণতা দেখা যায়। এতে দেহের তাপমাত্রা ১০৫° ফা. পর্যন্ত হতে পারে, যা শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।

উচ্চ জ্বরে শিশুর যে লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে সেগুলো হচ্ছে–

- খিঁচুনি, চেহারায় অস্বাভাবিকতা
- শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ির গতি বৃদ্ধি
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- ঘনঘন বমি ও পাতলা মলত্যাগ

এক্ষেত্রে যা করতে হবে –

- জ্বর না কমা পর্যন্ত মাথায় পানি ঢালতে হবে এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে সমস্ত শরীর বারবার ভালো করে মুছে দিতে হবে। দেহের তাপমাত্রা কমে আসলে শুকনা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে জামা পরাতে হবে।

জ্বরে তাপমাত্রা কমাতে গোসল করানো

- জ্বর যদি ১০৪° ফা. - ১০৫° ফা. হয় তবে জামা খুলে গোসল করাতে হবে। এতে তাপমাত্রা ২/৩ ডিগ্রি কমে আসবে।
- ঘরে মুক্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে, শিশুকে হাল্কা সুতির জামা পরাতে হবে।
- দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

জ্বরে খাদ্য ব্যবস্থা –

- জ্বর হলে বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, কোষকলা ক্ষয় হয়। ফলে দেহে প্রোটিন ও অন্যান্য খাদ্য উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই মাছ, ছোট মুরগি, দুধ-রুটি, পাতলা করে দুধ-সুজি, সুপ, নরম ভাত, পাতলা ডাল, নরম খিচুরি ইত্যাদি সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে।
- জ্বরে ঘামের সাথে শরীর থেকে প্রচুর পানি, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম লবণ বের হয়ে যায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই ফলের রস, সবজির সুপ, শরবত, ডাবের পানি, স্যালাইন ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে।

পাঠ ২ – ডায়রিয়া

ডায়রিয়া প্রধানত পানিবাহিত রোগ। ডায়রিয়া হলে খাদ্যদ্রব্য বেশিক্ষণ অন্ত্রে না থাকায় এগুলোর পরিপাক ও বিশোষণ সম্পূর্ণ হয় না ফলে খাদ্য উপাদানগুলো দ্রুত পায়খানার সাথে বের হয়ে যায়। প্রচুর অশোষিত পানি বের হয়ে যাওয়ার ফলে মল তরল হয়।

এর ফলে শিশুর মধ্যে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় –

- ঘনঘন পাতলা মলত্যাগ হয়
- বমি বমি ভাব বা বমি হয়
- মাথার তালুর মধ্যভাগ দেবে যায়
- চোখ কোটরাগত হয়
- শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়
- জিভ ও ঠোঁট শুকিয়ে যায়
- শিশুর ওজন হ্রাস পায়
- অবস্থা বেশি খারাপ হলে শিশু অচেতন হয়ে পড়ে

শিশুকে স্যালাইন খাওয়ানো

করণীয় – • ডায়রিয়া হওয়ার সাথে সাথে শিশুকে খাবার স্যালাইন দিতে হবে। এতে মারাত্মক পানিশূন্যতা থেকে শিশু রক্ষা পাবে। যতবার মলত্যাগ করবে ততবার খাবার স্যালাইন শিশুকে বেশি পরিমাণে দিতে হবে।

• স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি শিশুকে মায়ের দুধ দিতে হবে।

• তরল খাবার, যেমন— ফলের রস, রাইস স্যালাইন, লেবুর শরবত ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে।

• পাতলা মলত্যাগ বেশি হলে এবং শিশু মুখে স্যালাইন খেতে না পারলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

খাওয়ার স্যালাইন — ঘনঘন পাতলা মলত্যাগের ফলে শরীর থেকে প্রচুর জলীয় অংশ বের হয়ে যায়। যার সাথে পটাশিয়াম বাই-কার্বনেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং গ্লুকোজ নামক উপাদান বের হয়ে যায়। স্যালাইন খাওয়ার ফলেই সে অভাব পূরণ হয়। স্যালাইনে যে সকল উপাদান থাকে সেগুলো হচ্ছে– সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, গ্লুকোজ, নিরাপদ পানি। ঘরে সহজেই খাবার স্যালাইন তৈরি করে শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। ঘরে স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি–

উপকরণ	পরিমাণ
গুড়/ চিনি	এক মুঠ
লবণ	তিন আঙুলের এক চিমটি
নিরাপদ সাধারণ তাপমাত্রার ঠান্ডা পানি	আধা লিটার

একটি পাত্রে আধা লিটার নিরাপদ খাবার পানি, একমুঠো গুড় /চিনি ও তিন আঙুলের ১ চিমটি লবণ নিয়ে একটি চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে স্যালাইন তৈরি করতে হবে। তৈরি স্যালাইন ১২ ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। ডায়রিয়ার রোগীকে স্যালাইন খাওয়ানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পানিস্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশন রোধ করা।

স্যালাইন খাওয়ানোর নিয়ম —

- যতবার পাতলা মলত্যাগ করবে ততবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- শিশু বমি করলেও একটু অপেক্ষা করে আবার খাওয়াতে হবে।
- স্যালাইনের পাশাপাশি সুপ, ফলের রস, জাউভাত খাওয়ানো যেতে পারে।
- পাতলা পায়খানা ও বমি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্যালাইন চলবে।
- প্রয়োজনে রাইস স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়–

- সব সময় ফুটানো নিরাপদ পানি বা টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে।
- দুধ ভালোমতো ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখতে হবে, যাতে মাছি বা পোকামাকড় বসতে না পারে।
- খাবার গরম করে খেতে হবে।
- বাসি, পচা খাবার বর্জন করতে হবে।
- পরিষ্কার থালাবাসন বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাবার খেতে হবে।
- মল-মূত্র ত্যাগের পর হাত সাবান বা ছাই দিয়ে ধুতে হবে।
- বাজার থেকে আনা ফলমূল ভালো করে নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে খেতে হবে।

কাজ – ১ ডায়রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি তোমার পরিবারকে কীভাবে সতর্ক করবে?

পাঠ ৩ – সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও কৃমি

সর্দি-কাশি – সর্দি ও কাশির সাথে সবাই কমবেশি পরিচিত। অ্যালার্জি কিংবা বিভিন্ন ইনফেকশনজনিত কারণে সর্দি-কাশি হতে পারে। সাধারণত হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি হয় এবং সেই সাথে অনেক সময় সামান্য জ্বরও থাকে। সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময়, গ্রীষ্মকালে অধিক ঘাম ও ধুলাবালি থেকে এই রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

করণীয়–

- রুমাল বা টিসু ব্যবহার করা
- হালকা গরম পানি ও লবণ দিয়ে গড়গড়া করা
- প্রচুর পানি বা পানি জাতীয় খাবার যেমন–স্যালাইন, ফলের রস খাওয়া
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া

ইনফ্লুয়েঞ্জা – ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসজনিত, বায়ুবাহিত সংক্রামক ব্যাধি। ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশ করার ১৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রোগটি প্রকাশ পায়। শিশুদের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৭ দিন এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫ দিন রোগটি স্থায়ী হয়। এই রোগে অধিক জ্বর, সেই সাথে সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা ও গলাব্যথা থাকতে পারে। গ্রীষ্মকালে এই রোগটির প্রকোপ বেশি থাকে এবং যেখানে অনেক লোকের বাস সেখানে রোগটি দ্রুত ছড়ায়।

করণীয়–

- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করতে হবে এবং যেখানে সেখানে কফ, থুতু ফেলা যাবে না।
- আক্রান্ত শিশুটিকে অন্যান্য শিশু থেকে পৃথক রাখতে হবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভালো করে মাথা ধুয়ে শরীর মুছে ফেলতে হবে।
- তরল ও নরম খাবার খাওয়াতে হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াতে হবে।

সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের উপায়–

- ঋতু পরিবর্তনের সময় উপযুক্ত পোশাক পরতে হবে। গ্রীষ্মের সময় অধিক ঘাম হলে জামা খুলে শরীর মুছে ফেলতে হবে।
- নিরাপদ হালকা গরম পানি ও ফলের রস পান করা। ব্যায়াম ও বিশ্রাম নেওয়া, সুষম খাদ্য গ্রহণ, রোগটি যখন সংক্রামক আকারে ছড়ায় তখন বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন – লোকজনের ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

কৃমি– কৃমি মানুষের অন্ত্রে পরজীবী রূপে থাকে। আমাদের দেশের শিশুরাই এর দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। কৃমি শিশুর একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। শিশুরা তিন ধরনের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। যথা–

১. গোলকৃমি ২. সুতাকৃমি ৩. বক্রকৃমি

১। **গোলকৃমি–** এই কৃমি গোলাকার, আকারে বড়, দেখতে কেঁচোর মতো। তাই অনেকে কেঁচোকৃমিও বলে। কাঁচা শাকসবজি ও ফলের মাধ্যমে এ কৃমির ডিম মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং পরে অন্ত্রের মধ্যে এ কৃমির উৎপত্তি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় –

- শিশুর পেট বড় হয়ে ফুলে যায়। বমি বমি ভাব ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, ওজন কমে যায়।
- বদহজম ও দৈহিক দুর্বলতা দেখা দেয়। পেটে ব্যথা হয়, অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

২। **সুতাকৃমি–** এই কৃমি ছোট এবং সুতার মতো দেখায়। স্ত্রীকৃমি মলদ্বারে এসে ডিম পাড়ে। শিশুরা যখন মলদ্বার চুলকায় তখন নখের মধ্যে চলে আসে, পরে খাবার ও কাপড় চোপড়ের মাধ্যমে তা পরিবারের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর লক্ষণগুলো হচ্ছে – মলদ্বার খুব চুলকায় ও মলদ্বারে কৃমির ডিম দেখা যায়।

৩। **বক্রকৃমি–** যেসব শিশু খালি পায়ে মাটির পথ দিয়ে হেঁটে বেড়ায় তাদের মধ্যে এই কৃমি দেখা যায়। এই কৃমির ডিম চামড়ার মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে এবং অন্ত্রে প্রবেশের ফলে বড় কৃমিতে পরিণত হয়। লক্ষণ হচ্ছে – রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়, ফলে শিশুকে ফ্যাকাশে দেখায়।

প্রতিরোধের উপায়–

- যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ না করা। পাকা টয়লেট ব্যবহার করতে হবে।
- খাবার খাওয়ার আগে ও মল-মূত্র ত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খেতে হবে। ঠান্ডা ও বাসি খাবার পরিহার করতে হবে।
- হাতের নখ ছোট ও আঙুল পরিষ্কার রাখতে হবে।
- জুতা বা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবারের সবাইকে একসাথে কৃমিনাশক ঔষধ খেতে হবে।

পাঠ ৪ – হাম, যক্ষা, পোলিওমাইলাইটিস, মাম্পস

হাম – হাম ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। যেকোনো বয়সেই মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশের ১৪ দিনের মধ্যে হাম দেখা দেয়। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে —

- প্রথমে সর্দি হয়, নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে, মাথাব্যথা হয়, মুখমন্ডল ফুলে যায়।
- ১০৩° ফা. থেকে ১০৪° ফা. পর্যন্ত জ্বর উঠে। ৩/৪ দিন পর ঘামাচির মতো দানা বা র‍্যাশ প্রথমে কানের পেছনে দেখা যায়, পরে সারা শরীর ও মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। গাঢ় গোলাপি ও লাল রঙের র‍্যাশে সারা শরীর ফুলে যায়। র‍্যাশ বের হওয়ার ৫/৬ দিন পর র‍্যাশগুলোর রং হালকা হয়ে যায়, জ্বর কমে আসে। ৯/১০ দিন পর দানা শুকিয়ে চামড়া উঠতে থাকে।
- চোখে র‍্যাশ উঠলে চোখের পাতা ও মণি ফুলে যায়, চোখ লাল হয়ে যায়।
- গলার ভিতরেও র‍্যাশ উঠে ফলে শিশুর খেতে খুবই কষ্ট হয় ও বমি হয়।
- হাম সেরে যাওয়ার পর অনেক সময় নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

করণীয় –

- হাম হওয়ার সাথে সাথে শিশুকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। শুশ্রূষাকারীকে ছাড়া কারও ঐ ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। শুশ্রূষাকারী সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার আগে কাপড় বদলিয়ে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ভালো করে ধুয়ে দিতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত সব জিনিস আলাদা রাখতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। রোগ যাতে জটিল না হয় সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- তরল খাদ্য ঘনঘন খেতে দিতে হবে।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

প্রতিরোধের উপায় –

- যে বাড়িতে হাম দেখা দিবে সে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- ৯ মাস বয়সে শিশুকে হামের টিকা দিতে হবে।

কাজ – কৃমি ও ঘাম থেকে রক্ষার জন্য তুমি কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবে লেখো।

যক্ষ্মা – যক্ষ্মা এক প্রকার মারাত্মক সংক্রামক রোগ। মাইকো-ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ, আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি ও থুতু থেকে এ রোগের জীবাণু ছড়ায় ও অন্যকে আক্রান্ত করে।

লক্ষণ –

- প্রথমে অল্প অল্প জ্বর ও কাশি হয়।
- ক্ষুধা কমে যায়, শিশু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে, ওজন কমে যায়।
- আক্রান্ত গ্রন্থি ফুলে যায়, ব্যথা হয়, ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- ক্রমাগত এবং দীর্ঘদিন খুসখুসে কাশি, কফ এবং কফের সাথে রক্ত বের হয়।
- রাতে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, নাড়ির ক্রমাগত দ্রুত স্পন্দন, দেহে ক্লান্তি ভাব আসে।

যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশু

করণীয় – রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। রোগীকে পৃথক ঘরে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে, উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে রোগীকে রাখতে হবে। যক্ষ্মা রোগীর কফ, থুতু যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। যক্ষ্মা রোগীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও থালাবাসন পরিষ্কার করে আলাদা রাখতে হবে।

প্রতিরোধ – জন্মের পর এক ডোজ বিসিজি টিকা দিয়ে শিশুকে যক্ষ্মা রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

পোলিওমাইলাইটিস – ১০ বছরের কম বয়সের শিশুরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশের পর ৭ হতে ১০ দিন সময় লাগে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে।

লক্ষণগুলো হচ্ছে–

- ১-৩ দিনের মধ্যে শিশুর সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা, সামান্য জ্বর হয়।

- ৩-৫ দিন পর মাথার যন্ত্রণা থেকে ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, হাত বা পা অবশ হয়ে যায়। শিশু দাঁড়াতে চায় না, দাঁড় করাতে চাইলে কান্নাকাটি করে, আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং পরে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

- শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী মাংসপেশি এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

পোলিও রোগে আক্রান্ত শিশু

করণীয় – এই রোগটির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধের উপায় – চার ডোজ পোলিও টিকা খাওয়ালে শিশু পোলিও থেকে রক্ষা পায়।

মাম্পস – মাম্পস ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এই রোগ সব বয়সের মানুষের হয়। তবে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি হয়। বিশেষত শীতকালে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। রোগটি সংক্রমিত হওয়ার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়।

লক্ষণ – রোগের শুরুতে জ্বর হয়, ঘাড়ের পাশে কানের নিচে একপাশ বা উভয় পাশ ফুলে যায়, ব্যথা হয়, পরে সে ব্যথা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ খুলতে অসুবিধা হয়। শুক্রাশয়, অগ্ন্যাশয়, ডিম্বাশয়, হৃৎপিণ্ড, চোখ, কান ইত্যাদি অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে।

করণীয় – শিশুকে তরল খাবার যেমন—দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি দিতে হবে। কুসুম গরম পানি ও লবণ দিয়ে গার্গল করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠ ৫ – সংক্রমণমুক্তকরণ টিকা, ইনজেকশন–

রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যসেবায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ, উল্লেখযোগ্য ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ। ইপিআই একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংক্রমণ রোগ থেকে শিশুদের অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব রোধ করা। তাই বিশ্বব্যাপী রোগ প্রতিরোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।এছাড়া রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধ করা অনেক সহজ এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ।

আমাদের দেশে টিকাদান কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। এক বছরের কম বয়সের শিশুদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং বেশির ভাগ রোগ এই বয়সেই হয়ে থাকে। তাই শিশুকে রোগ প্রতিরোধক সবকয়টি টিকা নিয়মানুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিতে হবে।

ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকা দিয়ে যে রোগগুলো প্রতিরোধ করা যায় সেগুলো হচ্ছে—

বিসিজি টিকা – যক্ষ্মা রোগে বিসিজি টিকা দেওয়া হয়। এই টিকা দেওয়ার ২ সপ্তাহ পর টিকার স্থান লাল হয়ে ফুলে যায়। আরও ২/৩ সপ্তাহ পর শক্ত দানা, ক্ষত বা ঘা হতে পারে। ধীরে ধীরে এই ক্ষত বা ঘা শুকিয়ে যায়, দাগ থাকে। জন্মের পরই এই টিকা দেওয়া হয়।

ওপিভি টিকা – ওপিভি (ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন) টিকা পোলিও (পোলিও মাইলাইটিস) রোগ প্রতিরোধ করে। জন্মের পর ৬ সপ্তাহের মধ্যে ১ম ডোজ, ২৮ দিন পর ২য় ডোজ, পরবর্তী ২৮ দিন পর ৩য় ডোজ এবং ৯ মাস পূর্ণ হলে ৪র্থ ডোজ দিতে হয়।

পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন – এই টিকা ৫টি রোগ যেমন– ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি প্রতিরোধ করে। জন্মের ৬ সপ্তাহ পর প্রথম ডোজ এবং ২য় ও ৩য় ডোজ ২৮ দিন অন্তর অন্তর দিতে হয়।

হামের টিকা – হামের টিকা শিশুকে হাম রোগ থেকে প্রতিরোধ করে। শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে এই টিকা দিতে হয়।

টিটি টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড) – টিটি টিকা ধনুষ্টংকার রোগ থেকে রক্ষা করে।

১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের সকল মহিলাকে এবং যে সকল শিশুর ডিপিটি/পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেওয়ার পর খিঁচুনি হয়েছে তাদের এই টিকা দিতে হবে।

কাজ – রোগের নাম ও প্রতিরোধক টিকার নামের চার্ট তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?

ক. ৯৭° ফারেনহাইট　　খ. ৯৮.৪° ফারেনহাইট

গ. ৯৯.৪° ফারেনহাইট　　ঘ. ১০০° ফারেনহাইট

২০২১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তমার গত রাত হতে ঘনঘন পাতলা পায়খানা, বমি বমি ভাব হচ্ছে, চোখও প্রায় কোটরে ঢুকে গেছে। বাড়িতে কোনো স্যালাইন প্যাকেট না থাকায় ওর মা তাৎক্ষণিক চিনির শরবত খেতে দেন। এতে অবস্থার উন্নতি না হলে পাশের বাড়ির খালাম্মা এসে তমাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

২. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণে তমার শরীরে ঘাটতি হয়—

ক. গ্লুকোজ, নিরাপদ পানি, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট, ক্লোরিন

খ. গ্লুকোজ, জলীয় অংশ, পটাশিয়াম বাই কার্বনেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড

গ. সোডিয়াম সাইট্রেট, নিরাপদ পানি, গ্লুকোজ, ক্লোরিন ও জলীয়াংশ

ঘ. গ্লুকোজ, নিরাপদ পানি, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড

৩. পাশের বাড়ির খালাম্মা দ্রুত তমাকে হাসপাতালে না নিলে কী হতে পারতো—

i. দেহে মারাত্মকভাবে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি

ii. জিভ ও ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া

iii. অচেতন হয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কর্মজীবী আছিয়া সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কর্মস্থলে থাকে। তাঁর ৫ বছরের মেয়ে তুলি শারীরিকভাবে দুর্বল থাকার কারণে সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। ২-৩ দিন ধরে সে অল্প অল্প জ্বরে ভুগছে। আজ কর্মস্থল থেকে ফিরে তুলির খিঁচুনি ও চেহারার অস্বাভাবিকতা দেখতে পায়। দেহের তাপমাত্রা ১০৪° ফা. এ উঠলে প্রতিবেশী তাহমিনা তুলির শরীরের জামাকাপড় দ্রুত খুলে ফেলে এবং মাথায় ও গায়ে পানি দিয়ে জ্বর কমিয়ে আনে।

ক. মায়ের প্রথম দুধকে কী বলা হয়?

খ. আমাদের দেহে কতভাবে রোগ সংক্রমিত হয়?

গ. দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বে তুলিকে কী প্রক্রিয়ায় সুস্থ করা যেত— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর তাহমিনার দ্রুত সিদ্ধান্তই তুলির জ্বর কমাতে সহায়ক— মতামত দাও।

২. ফাইজা ৪ বছরের শিশু। গত ৩/৪দিন ধরে তার বেশ জ্বর। সারা শরীর দানায় ভরে গেছে। ঠিকমতো খেতেও পারছে না। ফাইজার বয়স যখন ৯ মাস পূর্ণ হয়েছিল তখন ওর মা শিশুকে প্রতিরোধক টিকা দেননি। চিকিৎসক ওর মাকে ঠান্ডা লাগাতে বারণ করেন। কারণ এতে নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। মায়ের সতর্কতা ও সেবায় ফাইজা সহজেই সুস্থ হয়ে উঠে।

ক. শিশুরা কত ধরনের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়?

খ. সর্দি-কাশি কখন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

গ. ফাইজার যে রোগ হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মায়ের সতর্কতা ও শুশ্রূষা ফাইজাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত জটিল রোগ থেকে সহজেই সুস্থ করে তোলে– বিশ্লেষণ করো।

পঞ্চম অধ্যায়

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

আমরা চারপাশে যেসব শিশু দেখি তারা নিশ্চয়ই সবাই একইরকম নয়। কিছু শিশু শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে সমাজের অন্যান্য সাধারণ শিশু থেকে আলাদা। যেসব শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষা, যত্ন ও পরিচর্যার দরকার হয়, তারাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। তারা হচ্ছে– প্রতিবন্ধী শিশু, অটিস্টিক শিশু ও প্রতিভাবান শিশু। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছ। এই পাঠে তোমরা অটিস্টিক শিশু ও প্রতিভাবান শিশু সম্পর্কে জানবে।

পাঠ ১ ও ২ – অটিস্টিক শিশু

আমরা আমাদের চারপাশে যে শিশুদের দেখি তাদের সকলের আচরণ কি একইরকম? কখনোই না। যেমন– বাড়িতে কোনো অতিথি এলে কোনো শিশু তার দিকে এগিয়ে যায়, সব প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দেয়। আবার অন্য একটি শিশু অতিথি দেখলেই সামনে থেকে সরে পড়ে, তার দিকে তাকায় না, ভয় পায়। এইসব ছোটখাট অসঙ্গতি খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন এইসব অসঙ্গতির এক বা একাধিক রূপ একই শিশুর মধ্যে প্রকটভাবে থাকে এবং সকলের কাছে সেগুলোগ্রহণযোগ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এইসব অক্ষমতার কারণ সকলের কাছে স্পষ্ট থাকে না। যেমন– দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও চোখে চোখে তারা তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। কিংবা বাক্‌শক্তি স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও কোনো কথা স্বাচ্ছন্দে বুঝিয়ে বলতে পারে না। এ ধরনের শিশুর অক্ষমতাগুলোর সীমা বা আওতা বিশাল। বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আচরণগত সীমাবদ্ধতার এইসব শিশুই অটিস্টিক শিশু বা অটিজমের শিকার।

অটিজম কোনো মানসিক রোগ নয়। অটিজম বিকাশগত অক্ষমতা ও নিউরোবায়োলজিক্যাল ডিজঅর্ডার। অটিজমের সুনির্দিষ্ট কারণ এখন পর্যন্ত অজানা। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অধিক হারে অটিজম আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অটিজমের ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুর অনুপাত প্রায় ১ঃ৪। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বর্তমানে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস প্রতি বছর ২রাএপ্রিল পালন করা হয়।

অটিজমের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য– আমরা সাধারণত যেসব রোগে ভুগে থাকি, তার লক্ষণগুলো সবার ক্ষেত্রে প্রায় একই থাকে। যেমন– টাইফয়েড হলে জ্বর হয়। কিন্তু অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের সমস্যা বা লক্ষণ একই হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। জন্মের পর থেকেই অটিজমের কারণে শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে থাকে। লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় দেড় থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে।

অটিজম শিশু বিকাশের তিনটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

১. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social interaction)– অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ না থাকা, কে কী করছে তা নিয়ে কৌতূহল না থাকা, অন্যের আচরণ বুঝতে না পারা।

২. যোগাযোগ (Communication)– কথা বলতে না শেখা, কোনোমতে কথা বলা, কথা বলতে পারলেও অন্যের সাথে আলাপচারিতা করতে সমর্থ না হওয়া।

৩. আচরণ (Pattern of Behaviour)– পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ অর্থাৎ একই কাজ বারবার করা। নিজস্ব রুটিন অনুযায়ী আচরণে অভ্যস্ত এবং এতে অনমনীয় থাকা।

অটিস্টিক শিশু

অটিজমের ত্রিমুখী সীমাবদ্ধতা

১. **সামাজিক মিথস্ক্রিয়া**– এক্ষেত্রে যে ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা যায়–

- মা-বাবা বা নিয়মিতভাবে দেখা হচ্ছে এমন আপনজনদেরও চোখে চোখ রেখে তাকায় না। চোখে চোখ দিয়ে যোগাযোগ অক্ষমতা অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে প্রকটভাবে দেখা যায়।
- শিশুকে নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় না। সে হয়তো নামের ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না।
- কোনো ধরনের আনন্দদায়ক বস্তু বা বিষয় সে অন্যদের সাথে শেয়ার করে না। যেমন–নতুন খেলনা পেলে স্বাভাবিক শিশুরা যেমন সবাইকে দেখায়, অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে কোনো খেলনার প্রতি আগ্রহ থাকলেও সেটা নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকে না।
- স্বাভাবিক শিশুরা কারও কোলে চড়তে বা আদর পেতে পছন্দ করে। কিন্তু অনেক অটিস্টিক শিশু এ ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকে। অন্য কারও সংস্পর্শে যাওয়াটা তারা তেমন পছন্দ করে না।

২. **যোগাযোগ**– এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলো হলো–

- ২-৩ বছর বয়সে শিশু যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে, অটিস্টিক শিশুরা তা পারে না।
- অনেক সময় ৩-৫ বছর বয়সেও দু-তিন শব্দের বেশি দিয়ে বাক্য বলতে পারে না। নিজের চাহিদাগুলো থার্ড পার্সনে বলে। নিজের নাম যদি হয় আসিফ তাহলে বলে 'আসিফ খাবে'।
- যেকোনো ছড়ার অল্প কিছু শব্দ সব সময় বলে। যেমন–তাই তাই মামা যাই দুধ খাই লাঠি পালাই। কিংবা আয় চাঁদ টিপ যা ইত্যাদি- একই শব্দ বা বাক্যাংশ বারবার উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। মা-বাবা মানা করলেও শোনে না বরং বিরক্ত হয়, রেগে যায়।

৩. **আচরণ**– এক্ষেত্রে যে ধরনের অসঙ্গতি থাকে তা হলো–

- অটিস্টিক শিশুরা বিশেষ ধরনের আচরণ বারবার করতে থাকে। হয়তো শরীর দোলাতে থাকে, আঙুল নাড়াতে থাকে, খেলনা বাক্সে ঢোকায়, আবার বের করে–এভাবে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়।
- অনেক অটিস্টিক শিশুই পেন্সিল ধরার স্বাভাবিক কায়দাটি পারে না, তারা মুঠোবন্দি করে ধরে।
- তারা অভ্যাসগত বিষয়গুলো মেনে চলতে ভালোবাসে। যেমন– বিছানায় যাওয়ার আগে হাত-মুখ ধোয়ার অভ্যাস থাকলে হঠাৎ একদিন তা বাদ পড়লে সে চিৎকার করে। এরকম প্রতিক্রিয়ার কারণে অটিস্টিক শিশুদেরকে জেদি বলে মনে করা হয়। বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে সে অস্বস্তি বোধ করে।
- অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে সাধারণত পঁচিশ শতাংশের খিঁচুনি থাকতে পারে।

উপরের লক্ষণগুলো সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে একসাথে নাও থাকতে পারে। এ ধরনের কয়েকটি লক্ষণ বেশি দিন ধরে থাকলে অবশ্যই শিশুটিকে নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিশুকে সমবয়সি শিশুদের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া। এর মাধ্যমে একই বয়সি অন্য শিশুর সাথে তুলনা করে শিশুর যেকোনো অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করা সম্ভব। শিশুর অটিজম দ্রুত শনাক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। যত কম বয়সে অটিজম শনাক্ত করা যায়, বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তত তাড়াতাড়ি তার আচরণের উন্নয়ন সম্ভব।

২০২৫

সমাজে অটিজম নিয়ে অনেক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আছে। এ কারণে অটিজম সম্পর্কে বাস্তবতাগুলো আমাদের স্পষ্টভাবে জানা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, অটিজম নিরাময়যোগ্য। চিকিৎসায় তা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অটিস্টিক শিশুরা আজীবন এই অক্ষমতার সমস্যায় ভোগে। অটিস্টিক শিশুর সমস্যাগুলো কখনই পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। যেটা সম্ভব তা হলো– নিবিড় পরিচর্যা ও যত্নের মাধ্যমে তার অক্ষমতা কমিয়ে আনা, যথাযথ সহযোগিতা, বিশেষ শিক্ষা দিয়ে পরিণত বয়সে তাকে যথাসম্ভব আত্মনির্ভর করা।

অনেক সময় মনে করা হয় যে, অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তি সুপ্ত প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অটিস্টিক কেউ হয়তো বিশেষ কোনো কাজে দক্ষতা দেখাতে পারে কিন্তু এটা নিছকই ব্যতিক্রমী ঘটনা। ২০-৩০% অটিস্টিক শিশুর বুদ্ধিবৃত্তীয় অক্ষমতা থাকে না। এ ধরনের অটিজমকে অ্যাসপারগার সিনড্রোম বলা হয়। এদের অনেকেই গণিতের মতো বিষয়ে স্বাভাবিক শিশুদের মতোই দক্ষতা অর্জন করতে পারে। তাদের মূল সমস্যা হলো কথাগুলোকে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিংবা কারও কথায় তারা মন্তব্য করতে পারে না।

অটিস্টিক শিশুদের জন্য আছে বিশেষ ধরনের স্কুল। এসব স্কুলে অটিস্টিক শিশুদেরকে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি তাদের জন্য উপযোগী কোনো পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের অক্ষমতা একটু একটু করে কমিয়ে আনার চেষ্টা করাই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অটিজম স্কুলের ছাত্রীর নিজের আঁকা ছবি

অটিজম স্কুলের পাঠদান

অটিজম স্কুলের ছাত্র আদিল, বয়স ১৩ বছর। অটিস্টিক শিশু আদিল সম্পর্কে তার মায়ের উক্তি –"আদিল কী কী পারে না, সে হিসাব আমি রাখতে চাই না। কী পারে সে কথাগুলোই বলতে চাই। ওকে নিয়ে যখন একা থাকি, তখন অনেক সময় মনেই হয় না – ওর কোনো সমস্যা আছে। আদিল নিজের দৈনন্দিন কাজগুলো

মোটামুটি ভালোই করতে পারে। সে পাঁচ তলা থেকে চাবি নিয়ে গিয়ে নিচতলা থেকে বাসায় আগত মেহমানকে সঙ্গে করে আনতে পারে। আবার মেহমানকে বিদায় দিয়ে চাবি নিয়ে বাসায় আসতে পারে। আদিল যথাসাধ্য চেষ্টা করে তার কথা আমাকে বুঝিয়েই ছাড়ে। এজন্যই তো বলতে চাই,"আদিল এখন স্বাভাবিক শিশু।" আদিলের এটুকু সক্ষমতায় তার মা তৃপ্ত। আদিলের মায়ের এই দৃঢ় মনোবল সকল অটিস্টিক শিশুর পরিবারের জন্য প্রেরণা।

আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই অটিজম সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ কারণে এই বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের পড়তে হয় চরম বিড়ম্বনায়। রাস্তাঘাটে চলাচলে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কিংবা সামাজিক কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে কোনো কোনো অটিস্টিক শিশুর অস্থিরতায় অনেকেই বিরক্ত হন। অভিভাবকদের অনেক সময়ই এ ধরনের মন্তব্য শুনতে হয় যে, পাগল বাচ্চাটিকে না আনলেও পারতেন। এভাবে পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে এরা থাকে উপেক্ষিত। ভালোবাসাহীন বিভিন্ন মন্তব্যে অভিভাবকরা হয়ে পড়েন বড় অসহায়। এসো আমরা সবাই অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়াই। অটিস্টিক শিশুর সহযোগিতায় গণসচেতনতা তৈরি করি।

দলীয় কাজ–১ তিনজন করে এক-একটি দলে ভাগ হয়ে অটিজমের লক্ষণগুলোর তালিকা তৈরি করো।
কাজ–২ একটি অটিস্টিক শিশুর সাথে তোমাদের আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত? লেখো।

পাঠ ৩ – প্রতিভাবান শিশু

কোনো কোনো শিশু অধিকাংশ শিশুর তুলনায় এক বা একাধিক ক্ষমতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করে থাকে। এরূপ শিশুরা প্রতিভাবান শিশু। প্রতিভাবান শিশু একাডেমিক শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, নেতৃত্ব, গবেষণা বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে উন্নত অবস্থান ও পারদর্শিতার প্রমাণ দেয়। শিশুর মধ্যে যখন বিভিন্ন দক্ষতা ও গুণাবলির সমন্বয় ঘটে তখন তারা প্রতিভাবান শিশু। এরাও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মধ্যে পড়ে। কারণ বিশেষ ধরনের পরিবেশ বা সুযোগ দেওয়া না হলে তাদের প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ হয় না।

প্রতিভাবান শিশুর বৈশিষ্ট্য–

১। শারীরিক দিক দিয়ে প্রতিভাবান শিশু ও সমবয়সি অন্যান্য শিশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সমাজে মেধাবী শিশু বলতেই মনে করা হয়– চোখে চশমা, হাতে বইয়ের বোঝা নিয়ে থাকা একটি শিশু। এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সমবয়সীদের চেয়ে প্রতিভাবান শিশুর শারীরিক কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে না। সমবয়সিদের ভিড়ে প্রতিভাবান শিশুকে পৃথকভাবে চেনা যাবে না।

২। বুদ্ধিমত্তা– বুদ্ধি পরিমাপ করার কিছু পদ্ধতি আছে যা দ্বারা শিশুর শারীরিক বয়সের তুলনায় মানসিক বয়স পরিমাপ করা হয়। বুদ্ধি পরিমাপের এককক বলা হয় বুদ্ধাংক বা Intelligence quotient সংক্ষেপে IQ। সাধারণত IQ ৭০ বা তার নিচে হলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ১০০ হলে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং IQ ১৩০-এর উপরে হলে তাকে প্রতিভাবান বলে ধরে নেওয়া হয়।

৩। প্রতিভাবান শিশুদের মানসিক দক্ষতা বেশি হয়। তারা সমস্যা সমাধানের এবং প্রশ্ন করার বিশেষ দক্ষতা রাখে। তুলনামূলকভাবে কম বয়সে এদের ভাষার বিকাশ হয়। তাদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ থাকে। সাধারণের চেয়ে বস্তু সম্পর্কে তারা বেশি জানে। এ ধরনের ছেলেমেয়েরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক কিছু শেখে।

৪। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। তাদের মনোযোগ ও স্মরণশক্তি অসাধারণ থাকে। একবার পড়লেই মনে থাকে। ফলে তারা তাড়াতাড়ি ও সহজেই শিখতে পারে। নিজের ক্লাসের ২/৩ ক্লাস উপরের পড়া বুঝতে পারে।

৫। প্রতিভাবান শিশুরা সৃজনশীল হয়। তারা কোনো কিছু উদ্ভাবন করতে পারে, নতুনভাবে চিন্তা করতে পারে। তাদের চিন্তাগুলো গতানুগতিক হয় না। তাতে স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা বেশি থাকে। যে কোনো সমস্যা সমাধানে অনেকগুলো পথ তারা উদ্ভাবন করতে পারে।

৬। অনেক সময় প্রতিভাবানরা সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। যেমন— নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশি চার বছরের প্রতিভাবান শিশু - রূপকথা

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ কম্পিউটার প্রোগ্রামার

যদি কোনো শিশুর মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তবে তার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ যত্ন ও উন্নত পরিবেশ না পেলে শিশুর প্রতিভা ঠিকমতো বিকাশ লাভ করে না। শিশু যে উন্নত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে উপযুক্ত পরিবেশে সেই বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে।

প্রতিভাবান শিশুর জন্য করণীয়–

- প্রতিভাবান শিশুরা যাতে শিক্ষার মধ্যে আনন্দ পায়, উৎসাহ পায় তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

- যে ক্ষেত্রেই মেধার পরিচয় পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রেই মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কেউ পড়াশোনায় দক্ষতার পরিচয় না দেখালেও সংগীত, সাহিত্য, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখালে তাকে সেক্ষেত্রে মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।
- তাদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্য বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে– যাতে শিশুর শিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসে। যেমন– পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

কাজ – প্রতিভাবান শিশুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি তালিকা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিশ্ব অটিস্টিক দিবস কোনটি?

(ক) ২রা ফেব্রুয়ারি (খ) ২রা এপ্রিল

(গ) ২রা জুন (ঘ) ২রা জুলাই

২। প্রতিভাবান শিশু তারা–

(ক) যাদের বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিক হয় (খ) যারা ছোটদের খুবই স্নেহ করে

(গ) যারা যুক্তিপূর্ণ কথা বলে (ঘ) যারা অন্যদের সাথে সহজে মেশে না

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সজল ও বাবুল দুই ভাই। ছোট ভাই সজল একা একা খেলতে পছন্দ করে। চোখে চোখে তাকায় না। মা-বাবা ও অন্য শিশুর সাথে ঠিকভাবে কথা বলতে সমস্যা হয়। দিন দিন তার আচরণে অনগ্রসরতা দেখা যায়।

৩। সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সজলের সমস্যা হলো–

(ক) অন্যকে খেয়ালই করে না এমন আচরণ করা

(খ) পরিচিত মুখ দেখলে হাসে কিন্তু চেনে না

(গ) ক্ষুধা পেলে তার মাকে প্রকাশ করে দেখায়

(ঘ) খেলনা পেলে অন্যদের সঙ্গে খেলা শুরু করে

৪। সজলের মা-বাবার অবস্থায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হলো–

(i) অন্যের সাথে সজলের সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা

(ii) তার প্রতিভার সন্ধান করা

(iii) তাকে বিশেষ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মিসেস রেহানার ৮ বছরের ছেলে রনি স্কুলের অন্য ছেলেদের মতো পড়াশোনা পারে না, শিক্ষক প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না, একই কথা বারবার বলে, খেলাধুলাতেও পিছিয়ে থাকে। শিক্ষকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন। মিসেস রেহেনা নিজে ছেলেটির যত্ন করেন। তারপরেও কোনো কিছুতে তার শেখার আগ্রহ দেখা যায় না। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তিনি রনিকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং মিসেস রেহানাকে রনির জন্য বিশেষ শিক্ষা ও যত্নের পরামর্শ দেন।

ক. অটিস্টিক শিশুর সমস্যার নাম কী?

খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে কী বোঝায়?

গ. কী কারণে রনি অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতায় রনির ক্ষমতার বিকাশ সম্ভব–কথাটির সঙ্গে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও।

২। কাঠমিস্ত্রি রশীদের ৬ বছরের ছেলে রোমেল অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে ফেলে। কৌতূহলের বশে সে বাবার যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার জেনে ফেলে। বাবা যতই শাসন করে না কেন, ছেলের যুক্তির কাছে কথা বলতে পারে না। বাড়িওয়ালা রশীদের ছেলেটিকে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য নিজেই ছেলেটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ক. কত বছর বয়সে অটিস্টিক শিশুর লক্ষণ দেখা যায়?

খ. অটিস্টিক শিশুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

গ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মধ্যে রোমেল কোন প্রকৃতির– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'বাড়িওয়ালার সহযোগিতা রোমেলের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক'– বক্তব্যটি যুক্তিসহকারে মূল্যায়ন করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা

পাঠ ১– মাদকাসক্তি

যেকোনো পরিবেশ বা অবস্থা দুটি দিক থেকে বিচার করা হয়। যে অবস্থা আমাদের সুবিধা দেয়, ভালো করে, কোনো রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না, এটি অনুকূল অবস্থা। যেমন– ভালো বন্ধুর সঙ্গ, শিক্ষকদের উৎসাহ, প্রশংসা, স্কুলে লেখাপড়া ইত্যাদি। এ অবস্থা আমাদের কাম্য। অন্যদিকে যে অবস্থা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, আমাদের ভালো করে না, এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক নয়, সেটাই প্রতিকূল অবস্থা। যেমন– অসৎ সঙ্গ, বখাটে দলের হয়রানির শিকার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এগুলো আমাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা দেয় যা আমরা কখনোই চাই না।

বর্তমানে মাদকাসক্তি কথাটি এত বেশি প্রচলিত যে, তোমরাও এ সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই অনেক কিছু জেনে গেছ। সারা বিশ্ব আজ মাদকদ্রব্য সেবন সংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের দেশেও মাদকাসক্তির ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা এখন মাদকদ্রব্য কী, কীভাবে এতে আসক্তি হয়, এর ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী এবং এর ভয়ংকর পরিণতির কথা জানব।

মাদকদ্রব্য এক ধরনের পদার্থ যা ব্যবহার বা সেবন করলে আমাদের শরীর ও মনের ক্ষতি হয়, ব্যবহারকারীর মধ্যে নেশা তৈরি করে, পর্যায়ক্রমে গ্রহণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ দ্রব্য যখন সেবনের দরকার হয় তখনকার অবস্থাকে বলা হয় আসক্তি। বিড়ি, সিগারেট, তামাকের ধোঁয়া সেবন হলো ধূমপান। গাঁজা, আফিম, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা এগুলো সবই মাদকদ্রব্য। ধূমপান এবং এসব দ্রব্য যখন ব্যক্তির মধ্যে আসক্তি বা নেশা তৈরি করে তখনকার অবস্থাই হলো মাদকাসক্তি।

কৈশোরকাল কৌতূহলের বয়স। নিছক কৌতূহলের বশেই অনেকে মাদক গ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। অনেক সময় যেকোনো ব্যর্থতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মাদক গ্রহণের অভ্যাস তৈরি হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৈশোরের ছেলেমেয়েরা খারাপ দলে মেশার ফলে মাদকদ্রব্য সেবনে জড়িত হয়। মাদকাসক্ত সঙ্গীরা নিজের কাজের সহযোগী খোঁজে। তারা এটি গ্রহণে প্ররোচনা দেয়। এভাবে সঙ্গদোষে মাদকের বদ অভ্যাস গড়ে উঠে। মাদকদ্রব্য গ্রহণের স্বাস্থ্যগত পরিণাম বা অন্যান্য ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে না জানার কারণে প্রথম দিকে সেবনকারী সমস্যার ভয়াবহতা বুঝতে পারে না। যখন এর বিপদ বুঝতে পারে তখন সেবন ছেড়ে দেওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাকে সুস্থ করার জন্য তার নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির সাথে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে আস্তে আস্তে সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মতো হয়ে যায়। এটি তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। মাদকাসক্তি কোনো ব্যক্তিকে, তার পরিবারকে এবং এভাবে সমাজ জীবনকে নানা দিক দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। ব্যবহারকারীর মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয়। এছাড়া স্বাভাবিক প্রজনন ক্রিয়ার জটিলতা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা এবং পারিবারিক সম্পর্কেরও অবনতি ঘটায়।

মাদক ব্যবহারকারীরা নানারকমের অসামাজিক কাজ করে। যেমন—চুরি, ছিনতাই, হাইজ্যাক ইত্যাদি। এ সকল আচরণ বিভিন্নরকম সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক–

শারীরিক ক্ষতি

শ্বাসনালি, হৃদযন্ত্রের ক্ষতি, কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস, রক্ত দূষণ, অনিদ্রা, খাবারে অরুচি, পেট ব্যথা, এইডস, হেপাটাইটিস–বি সংক্রমণের আশঙ্কা।

মানসিক ক্ষতি

শেখার ক্ষমতা হ্রাস, পড়াশোনায় অমনোযোগী, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, উদ্যমের অভাব, অলসতা, অবসাদ ও বিষণ্ণতা, উগ্র আচরণ।

মাদকাসক্তি

আর্থিক ক্ষতি ও নৈতিক অবক্ষয়

পরিবারকে আর্থিক সংকটে ফেলা, ধার নেওয়া, চুরি করা, ন্যায়-অন্যায় বোধ না থাকা, মিথ্যা বলা।

সামাজিক সমস্যা

কাজ করার আগ্রহ কমে যাওয়া, মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অভাব, সহজে অপরাধ জগতে প্রবেশ।

মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো কত ভয়াবহ হতে পারে তা আমরা জানলাম। এই ক্ষতির দিকগুলো তোমাদের বারবার মনে করতে হবে। তোমরা দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নেবে কোনোদিনই মাদকের ছোবলে ধরা দিবে না। নিজেদের এই প্রতিজ্ঞা ছড়িয়ে দিবে পাড়ায়, মহল্লায় এবং সমবয়সি বন্ধুর দলে।

মানুষের জীবনে কখনো কখনো খারাপ সময় আসতেই পারে। যার কারণে বিষণ্ণতা আসে, আসে হতাশা। এই হতাশাকে কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট কখনোই চিরস্থায়ী নয়। মাদককে 'না' বলার শক্তিই মাদক প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় উপায়।

কাজ–১ মাদকাসক্তির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করো।
কাজ–২ মাদকাসক্তি রোধ সম্পর্কে কয়েকটি স্লোগান তৈরি করো।

পাঠ ২ – বাল্যবিবাহ, যৌতুক

বাল্যবিবাহ – জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৯০ এ যে সকল দেশ স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। আমরা জানি যে, এই সনদে জন্ম থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত প্রত্যেককেই শিশু বলা হয়েছে। এই সনদে উল্লেখ আছে ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা এবং ২১ বছরের নিচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারবে না।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়। ছেলের বয়স ২১ বছরের নিচে এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে যে বিয়ে হয় তাই বাল্যবিবাহ। শুধু ছেলের বয়স ২১-এর কম বা শুধু মেয়ের বয়স ১৮-এর কম হলে সেই বিয়েকেও বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাল্যবিবাহে বর বা কনে যেকোনো একজন বা উভয়ে শিশু থাকে।

বাল্যবিবাহের নীতিটি মানার ক্ষেত্রে মূল বাধাটি হচ্ছে আমাদের দেশে দরিদ্র, অশিক্ষিত পরিবারে অভিভাবকরা শিশুর সঠিক বয়সের হিসাব রাখেন না এবং সব শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা হয় না। সাধারণত আমাদের দেশে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়ে থাকে।

ছেলেদের ক্ষেত্রেও অভাব অনটনকেই দায়ী করা যেতে পারে। মেয়ে পক্ষ থেকে অর্থ পাওয়ার আশায় উপযুক্ত ছেলেদের বয়সের আগেই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ কেন ক্ষতিকর?

- ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হলে সঠিক সময়ের আগে বা কম ওজনের সন্তান জন্ম দেওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- প্রাপ্ত বয়সের তুলনায় কিশোরীদের সন্তান জন্ম দেওয়া অনেক কঠিন ও বিপজ্জনক। কিশোরীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান জন্মের প্রথম বছরের মধ্যে মারা যাওয়ার আশঙ্কাও বেশি।
- ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত কোনো মেয়ের শরীর সন্তান প্রসবের জন্য উপযুক্ত হয় না। তাই এ বয়সে গর্ভধারণ ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—সময়ের আগে সন্তান প্রসব, উচ্চ রক্তচাপ, খিচুনি, রক্তস্বল্পতা, প্রসবে জটিলতা, এমনকি মা ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে।

ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহে লেখাপড়ার ক্ষতি হয় বা লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। সন্তান হলে তাদেরকে মা-বাবার দায়িত্ব বহন করতে হয়। এতে মানসিক চাপ বাড়ে আবার আর্থিক সংকটেরও সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মেয়েদের ১৮ বছরের আগে এবং ছেলেদের ২১ বছরের আগে বিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে। নিজের ক্ষেত্রে এরকম প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রেও যেকোনো ভাবে বাধা দিতে হবে। বাল্যবিবাহের কুফলগুলো অভিভাবকদের বলতে হবে।

কাজ– বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলোর তালিকা করো।

যৌতুক

একটি বিয়েতে দুইটি পক্ষ থাকে – বরপক্ষ এবং কনেপক্ষ। এ দুই পক্ষকে উপহার দেওয়ার প্রচলন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু যখন যেকোনো পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যবান সম্পদ, অর্থ দেওয়ার জন্য আর একপক্ষ দ্বারা বাধ্য হতে হয় তখন সেটা যৌতুক হিসেবে গণ্য হয়। এটাকে অন্য কথায় দাবি বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মেয়ে পক্ষের উপর এই দাবি বা যৌতুকের বোঝা চাপানো হয়। বর্তমানে এই দাবি মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। যৌতুক ছাড়া দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের বিয়ে কল্পনাই করা যায় না। যৌতুকের বোঝা চাপানো সেই পরিবারটির উপর এক ধরনের নির্যাতন। বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ তে বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তি কনেপক্ষ বা বরপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করলে ১-৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। বাংলাদেশে যৌতুক গ্রহণের প্রধান কারণ হলো পরিবারটির আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও বেকারত্ব। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যৌতুকের মাধ্যমে পরিবারটি সচ্ছলতা খোঁজে।

যৌতুকের ক্ষতিকর দিক– বরপক্ষের দাবি মেটানোর জন্য কনেপক্ষের পরিবারে অনেক রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক পরিবারে জমি বিক্রি করা হয়, ব্যাংকের সঞ্চিত টাকা তুলে ফেলতে হয়। অনেক সময় পরিবারের ছোট সদস্যদের লেখাপড়ার জন্য সঞ্চিত অর্থ যৌতুকের জন্য ব্যয় হয়। সুতরাং যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সমাজের সকলকে সচেতন করতে হবে।

যৌতুকের বিনিময়ে বিয়ে

তুমি মেয়ে কিংবা ছেলে যেই হও না কেন যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে তোমাদের সোচ্চার হতে হবে। নিজেদের পরিবারে, আত্মীয়স্বজন অথবা প্রতিবেশী পরিবারে যৌতুকের শর্তে যেন কোনো সম্পর্কের বন্ধন তৈরি না হয় তার বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

কাজ– যৌতুক প্রতিরোধে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পার, তা লেখো।

পাঠ ৩ – যৌন নিপীড়ন

সাধারণত যৌনবিষয়ক কথাবার্তার মধ্যে একটু গোপনীয়তা, একটু সংকোচ জড়িয়ে থাকে। আমাদের চারপাশে যৌন নিপীড়নের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলোর পরিণতি হয় খুবই বেদনাদায়ক। এসব প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও অন্যদেরকে সতর্ক করা খুবই জরুরি। কী করলে যৌন নিপীড়নের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না তা জানতে হবে। তাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের লক্ষ্যে এ পাঠটিকে তোমরা অত্যন্ত জরুরি একটি পাঠ মনে করবে। যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার জন্য এ পাঠটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

যৌন বিষয়ক কথা, ইঙ্গিত, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দিয়ে কাউকে বিরক্ত করা হলো যৌন হয়রানি। আর অন্যের দ্বারা শরীরের গোপন অংশে স্পর্শ বা আঘাত যৌন নিপীড়নের মধ্যে পড়ে। বয়ঃসন্ধিকালে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও যৌন বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক সময় অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। কয়েকদিনের জন্য রাশেদা বেড়াতে এসেছে আত্মীয়ের বাড়িতে। কিশোরী রাশেদার আনন্দ আর ধরে না। বিকাল হতে না হতেই পাশের বাড়ির পরিচিত ভাইয়ের সাথে ঘুরতে বের হয় সে। নদীর পাড়ের বাঁধা রাস্তার পাশ দিয়ে আখের খেত, নদীর সৌন্দর্য, মাঝি, নৌকা ইত্যাদি উপভোগ করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফেরার পথে কিশোর ছেলেটির মাথায় খারাপ চিন্তা আসে। সে রাশেদার হাতটি ধরে এবং কাছে আসতে চায়। রাশেদা সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেয় এবং দ্রুত হেঁটে নিজেকে রক্ষা করে। ঘটনাটি সে কাউকে বলতে পারে না। প্রায়ই ঘটনাটি তার মনে কষ্ট দেয়। রাস্তায় যেকোনো কিশোর দেখলে ভয়ে চমকে উঠে। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, এরকম পরিস্থিতিতে তোমরাও পড়তে পার?

যেকোনো বয়সে যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তবে কৈশোরে এসব ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অন্য সব বয়সের চেয়ে বেশি থাকে। যারা যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হয় তাদের মধ্যে অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে–

- সব সময় ঐ ঘটনা মনে পড়তে থাকে, মন থেকে আতঙ্ক বা ভয় দূর হয় না।
- কাউকে বলতে না পারায় মানসিক চাপ পড়ে, ফলে পড়াশোনায় মনোযোগ আসে না।
- অনেক ক্ষেত্রে লজ্জা ও অপমান সহ্য করা নিজের ও পরিবারের জন্য কষ্টদায়ক হয়।

কাজ—যৌন হয়রানি এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হলে কী করা উচিত লেখো।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৈশোরে ছেলেমেয়েদের যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ঝুঁকি বেশি থাকে। পাড়ার বখাটে দল কিংবা সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানির মতো ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু যৌন নিপীড়ন সমবয়সি

ছাড়াও নিকটাত্মীয়, পরিচিত ব্যক্তি, বয়স্ক যেকোনো সদস্যদের দ্বারা ও হতে পারে। এসব প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমাদের যে যে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে সেগুলো হলো–

- বাড়িতে একা থাকলে সাবধানে থাকা
- পরিচিত, অপরিচিত কারও সাথে একা বেড়াতে গেলে নিজে সচেতন থাকা
- মন্দ স্পর্শ টের পেলে অবশ্যই তা সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবাকে জানানো
- কোনো হয়রানির সম্মুখীন হলে কৌশলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা এবং বাবা-মা, শিক্ষক ও আপনজনকে জানানো

যৌন নিপীড়নের আরেক ধরনের ভয়ংকর চিত্র তোমাদের জানা দরকার। অনেক সময় শৈশবের ছেলেমেয়েরা পরিবার ও সমাজের বয়স্ক সদস্য কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। পরিবারের খুব কাছের আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি শিশুটিকে যেকোনো সময়ে একা পেয়ে এ ধরনের গর্হিত কাজ করতে পারে। ব্যক্তিটির সাথে পরিবারের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ থাকে বলে তার সাথে সন্তান একা বাড়িতে থাকলে মা-বাবার কোনো রকম দুশ্চিন্তা হয় না। ছেলেশিশুরাও পুরুষ ব্যক্তির দ্বারা শরীরের গোপন অঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। এ ধরনের নিপীড়নে শিশুরা প্রচণ্ড ভয় পায়। অপরাধী শাসায় বলে তারা বিষয়টি কাউকে বলতে পারে না। এতে তাদের নানা ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে নিপীড়নের শিকার হয়, তাকেই দোষারোপ করা হয়। আমাদের উচিত অপরাধীর মুখোশ সকলের কাছে খুলে দেওয়া এবং তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব প্রত্যেক মা-বাবার এবং আমাদের সকলের।

কাজ– যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি প্রতিরোধে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তা লেখো।

পাঠ ৪ – বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা

আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সাকিব। সে অনেক ভালো। আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি। আমি তাকে আমার এমন ভিতরের কথা বলতে পারি যা অন্য কেউ জানবে না। সে কাউকে বলে দেবে না এটাও বুঝতে পারি। আমার অনেক বন্ধু আছে। কিন্তু সে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা একে অন্যের আবেগ-অনুভূতি বিনিময় করি। কখনো একে অন্যকে দুঃখ দিই না বা আঘাত দিয়ে কথা বলি না। বিপদে পড়লেই একে অন্যকে সাহায্য করি। সে যখন ভুল পথে যায়, আমি তাকে সতর্ক করি। আবার আমার ক্ষেত্রে সেও এমনটি করে। আমরা সব বন্ধু মিলে অনেক কথাই বলি কিন্তু এমন কিছু কথা যেটা শুধু তাকেই বলা যায়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের এক কিশোর তার বন্ধু সম্পর্কে এভাবেই বর্ণনা করে। পূর্বের পাঠে সমবয়সি দলের কথা তোমরা জেনেছ। কিন্তু বন্ধু কারা বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বৈশিষ্ট্য কী এটা তোমরা উপরের উক্তিগুলোর মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

বন্ধুর সংজ্ঞা একেক বয়সে একেক রকম থাকে। ছোটবেলায় খেলার সাথিরাই বন্ধু। স্কুলের প্রথম দিকে ক্লাসের সকলেই তার বন্ধু। কিন্তু মধ্য শৈশবে কিংবা কৈশোরে বন্ধু তারাই যাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকে, সহযোগিতা থাকে, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে। তারা একে অন্যকে বুঝতে পারে। এ সময়ের বন্ধুত্ব এতই গভীর থাকে যে তাদের একই রকম পছন্দ থাকে, একই রকম আগ্রহ থাকে, তারা পরস্পরের প্রতি অনুগত থাকে। যেকোনো বিপদে একজনকে ছেড়ে অন্যজন সরে পড়ে না। বন্ধুত্বের মধ্যে খোলামেলা, স্পষ্ট, লুকোচুরি না করে কথাবার্তা চলে। পরস্পরের প্রতি গভীর স্নেহ-মমতা থাকে। যে কোনো কিছু তারা সহজেই বন্ধুকে বলতে পারে। এতে মানসিক চাপ কমে।

এতক্ষণ আমরা জানলাম বন্ধুত্ব আমাদের জীবনে অনেকখানি স্থান দখল করে আছে। এই বন্ধু যখন ভালো বন্ধু হয়, তখন তা আমাদের বিকাশে সহায়তা করে। ভালো বন্ধু দিয়ে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়, স্কুলে অংশগ্রহণ বাড়ে।

বিভিন্ন অনিয়ম, অসৎ কাজ, বদ অভ্যাস, বন্ধুদের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়। খারাপ বন্ধু আমাদের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। বন্ধু যখন আমাদের জীবনে এত গভীরভাবে প্রভাব ফেলে তখন আমাদের অবশ্যই বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হওয়া দরকার।

কাজ– তোমার সহপাঠীর মধ্যে থেকে দুজন বন্ধুর নাম উল্লেখ কর। তারা কেন তোমার বন্ধু তা লেখো।

কৈশোরে বন্ধু আমাদের কীভাবে সাহায্য করে?

বন্ধুত্ব দেয়–

সাহচর্য, কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বস্তু আদানপ্রদান করা যায়, একে অন্যের দুর্বল দিকের প্রতি সচেতন হওয়া যায়। অন্যদের তুলনায় আমি কেমন সেটা বন্ধুর মাধ্যমে বোঝা যায়। আর আমি ঠিক কাজটি করছি কি না এ ধারণাও বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া যায়।

ভালো ও খারাপ বন্ধু চেনার উপায়

ভালো বন্ধু	খারাপ বন্ধু
• ভালো বন্ধু পড়াশোনায় মনোযোগী	• পড়াশোনায় অমনোযোগী
• সত্য কথা বলে	• মিথ্যা বলতে সংকোচ বোধ করে না
• স্কুল ও সমাজের নিয়ম মেনে চলে	• স্কুল ও সমাজের নিয়ম মানে না
• সকলের সাথে ভালো আচরণ করে	• ঝগড়া, মারামারি করে
• গঠনমূলক কাজ করে	• সমস্যা তৈরি করে
• ভালো কাজে উৎসাহী থাকে	• অসৎ কাজে উৎসাহী থাকে
• যৌন পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কথাবার্তা বলে	• অশ্লীল আলোচনা করে
• ধূমপান ও মাদক প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকে	• ধূমপান করে, অন্যকে ধূমপানে প্ররোচিত করে

অনেক সময় বিপরীত লিঙ্গের সাথে বন্ধুত্ব হয়। এক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে যেন সম্পর্কের একটি সীমারেখা থাকে। তোমরা পূর্বের পাঠে জেনেছ যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেলামেশা মুগ্ধতা আনতে পারে, যা এ বয়সের জন্য ক্ষতিকর।

কাজ– খারাপ ও ভালো বন্ধু চেনার উপায়গুলো কী?

পাঠ ৫ – প্রচার মাধ্যম

প্রচার মাধ্যম বলতে রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইন প্রচারমাধ্যম ইত্যাদিকে বুঝি। এ সকল প্রচার মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার আমাদের সুষ্ঠু জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। আমরা প্রচুর তথ্য জানতে পারি। যেকোনো বিষয়ে সঠিক ধারণা পাই, অল্প সময়ে খবর পাঠাতে পারি, যোগাযোগ সহজ হয়।

বিরতিহীনভাবে টেলিভিশন দেখা ক্ষতিকর। টিভিতে অধিক সময় ব্যয় করলে লেখাপড়া, খেলাধুলা বা অন্যান্য কাজের সময় কমে আসে। এছাড়াও তারা প্রাকৃতিক আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত হয়। তারা এমন অনেক অনুপযোগী অনুষ্ঠান দেখে যার কারণে তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করতে উৎসাহিত হতে পারে। অনেকক্ষণ টিভি দেখলে শারীরিকভাবেও ক্লান্তি আসে।

টিভির এমন অনেক অনুষ্ঠান আছে যা দেখলে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। যেমন–পশুপাখি-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান। এ ধরনের অনুষ্ঠান তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে ধারণা দেয়। বইপত্র পড়ে যা শেখা হয়েছে সেটারই যেন ব্যবহারিক জ্ঞান হয়। আবার টিভির কিছু চ্যানেলে এমন অনুষ্ঠানও দেখানো হয়, যা আমাদের ক্ষতি করে। যেমন–সহিংসতা, ছিনতাই, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি। এগুলো দেখার ফলে অনুরূপ স্বভাব আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। এ কারণে টিভি দেখার উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। দেখার জন্য টিভির কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। যে অনুষ্ঠানগুলো শিক্ষামূলক বা সামাজিক কিংবা শিশু-কিশোরদের বয়সোপযোগী সেসব অনুষ্ঠান আমাদের বুদ্ধি ও সামাজিক দক্ষতা বাড়ায়।

- সকলে একসাথে টিভির কোনো অনুষ্ঠান দেখলে বেশি শেখা যায়। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং আলাপ-আলোচনায় অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
- পড়ার ঘরে টিভি না রাখা বা টিভির ঘরে পড়াশোনা করা উচিত নয়। এতে মনোযোগ নষ্ট হয়।
- ছাত্রজীবনে খুব অল্প সময় টিভি দেখার জন্য ব্যয় করলে পড়াশোনার ক্ষতি কম হয়।

বড়দের সাথে টিভি দেখলে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে অনেক বেশি জানা যায়

কাজ– টিভির ক্ষতিকর দিক থেকে মুক্ত থাকতে তুমি কোন কোন বিষয় অনুসরণ করবে–লেখো।

প্রচার মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হলো কম্পিউটার। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, আবহাওয়া, পরিবেশ রক্ষা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক সুবিধা দেয়। আমরা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না করি তাহলে মূল্যবান ও উপকারী এই যন্ত্রটিও আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কম্পিউটারে ওয়েব সাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা প্রচুর তথ্য পাই। যখন যা জানতে চাওয়া হয় অল্প সময়েই তা সংগ্রহ করতে পারি। লেখাপড়ার কাজে সর্বশেষ তথ্যগুলো আমাদের জানাকে সমৃদ্ধ করে। এছাড়াও অত্যন্ত কম সময়ে ও সহজভাবে আমরা কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

অনেক সময় কম্পিউটারকে আমরা খেলার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করি। যারা অনেক বেশি গেইম খেলে তারা যখন গেইম খেলে না, তখনো ঐ গেইম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তারা বুঝতে পারে যে তারা বেশি সময় ধরে খেলছে কিন্তু তারা নেশাগ্রস্তের মতো এটা বন্ধ করতে পারে না। এসব ছেলেমেয়ের মধ্যে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

- গেইম খেলায় শরীরের ওজন অতিরিক্ত বাড়তে পারে।
- দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকার জন্য চোখের সমস্যা হতে পারে।
- দীর্ঘ সময় বসে থাকার জন্য ঘাড়ে, পিঠে ব্যথা হতে পারে।
- দৈনন্দিন জীবনের জ্ঞান কম হয়।
- বাইরে খেলাধুলার সময় ও আগ্রহ কমে আসে।
- সকলের সাথে বেড়ানো, দেখা-সাক্ষাৎ কম হয়।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কম্পিউটারের ব্যবহার

ইন্টারনেটে এমন অনেক সাইট আছে, যেগুলোতে প্রবেশ প্রাপ্তবয়সের আগে নিষিদ্ধ। অনেক সময়ে কৈশোরের ছেলেমেয়েরা কৌতূহলের কারণে ঐসব নিষিদ্ধ সাইটে প্রবেশ করে। এতে তাদের নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা থাকে।

খুব দ্রুত যেকোনো খবর ছড়িয়ে দেওয়ার বড় একটি মাধ্যম হলো ফেসবুক। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকের মাধ্যমে বন্ধুত্ব তৈরি করা এবং যোগাযোগ করা আমাদের জন্য অনেক ক্ষতিকর। যেসব ছেলেমেয়ে অনলাইন যোগাযোগে বেশি সময় ব্যয় করে, তাদের সাথে মা-বাবার দ্বন্দ্ব, বিরোধ বেশি হয়। কম্পিউটারকে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করলে আমরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারব।

কাজ– কম্পিউটার ব্যবহারের ভালো দিক ও খারাপ দিক-এর তালিকা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কৌতূহলের বয়স কোনটি?

ক. একবছর বয়স
খ. কৈশোর কাল
গ. যৌবন কাল
ঘ. বৃদ্ধ কাল

২. মাদকদ্রব্য গ্রহণে সামাজিক কোন সমস্যা হয়?

ক. কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়
খ. শেখার ক্ষমতা হ্রাস পায়
গ. পারিবারিক আর্থিক সংকট হয়
ঘ. সহজে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাভেদ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলগঠন, বন্ধুপ্রীতি এগুলোর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল এবং ঘরে দেরি করে ফিরত। ঘরে দেরি করে ফেরার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে মেজাজ করত। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে ধর্মের শিক্ষকের কাছে মাদকাসক্তির মন্দ দিক, ভালো বন্ধু, মন্দ বন্ধু, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জেনেছে। সে আরও জেনেছে এ বয়সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেলামেশার ফলে নিজের ক্ষতি হতে পারে। এখন সে খুব সতর্কতার সাথে চলাফেরা করে।

৩. জাভেদের মতো কিশোররা মাদকাসক্তির কুফল কাদের মাঝে ছড়িয়ে দেবে?

ক. নিজ শ্রেণি ও সকল শ্রেণিতে
খ. ঘরে ঘরে ও আত্মীয়স্বজনদের মাঝে
গ. পাড়ায় ও ভাইবোনদের মাঝে
ঘ. পাড়া, মহল্লা ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে

৪. ধর্মীয় শিক্ষকের শিক্ষা জাভেদকে সচেতন করবে–

i. খারাপ দলে না মেশার
ii. স্বাস্থ্যগত পরিণাম সম্পর্কে
iii. ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১০ম শ্রেণির কামাল মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান মা-বাবা দুজনেই চাকরি নিয়ে খুব ব্যস্ত। বন্ধু এজাজের সঙ্গে সে প্রাইভেট পড়তে যায়। ইদানীং সে ঘরে দেরি করে ফেরে, খেতে চায় না, পড়াশোনায় মনোযোগ কম এবং শরীর সব সময়ই খারাপ থাকে। কারণে-অকারণে এজাজের কাছে চলে যায়। মা-বাবা কিছু বলতে গেলে মিথ্যা বলতে সংকোচ বোধ করে না। কামালের এই আচরণ মা-বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে।

ক. প্রতিকূল অবস্থা কী?
খ. মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝায়?
গ. এজাজের বন্ধুত্ব কামালের পড়াশোনাকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে- তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. "ভালো বন্ধু নির্বাচনের মাধ্যমে কামালের বর্তমান অবস্থা উত্তরণ সম্ভব"– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও।

২. জুলেখা সপ্তম শ্রেণিতে গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করে। দাদা-দাদি ওর বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ছেলেপক্ষ অনেক কিছুই দাবি করছে। কিন্তু টিভিতে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো জানার পর জুলেখার বাবা এখন জুলেখার বিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।

ক. জাতিসংঘ সনদে কত বছর বয়সকে শিশু বলা হয়েছে?
খ. কম্পিউটারে আমরা সহজে তথ্য পাই কেন?
গ. দাদা-দাদির উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের কোন অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে–ব্যাখ্যা করো।
ঘ. জুলেখার বাবার সিদ্ধান্ত জুলেখাকে দৈহিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে–তুমি কি একমত?–যুক্তি দেখাও।

গ বিভাগ

খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

এই বিভাগে আমরা খাদ্য পরিকল্পনা, মেনু পরিকল্পনার নীতি, ১০০০ দিনের পুষ্টিসহ বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মেনু, ওজনাধিক্য ও স্বল্প ওজনের শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা, অপুষ্টি, অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগ এবং এদের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা করতে হলে কয়েকটি ধাপে তা করতে হয়। যেমন– ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ভেজালমুক্ত খাদ্য ক্রয়, পুষ্টিমান বজায় রেখে তা কাটা, ধোয়া এবং রান্না করা ইত্যাদি। এই বিভাগে আমরা এগুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করব।

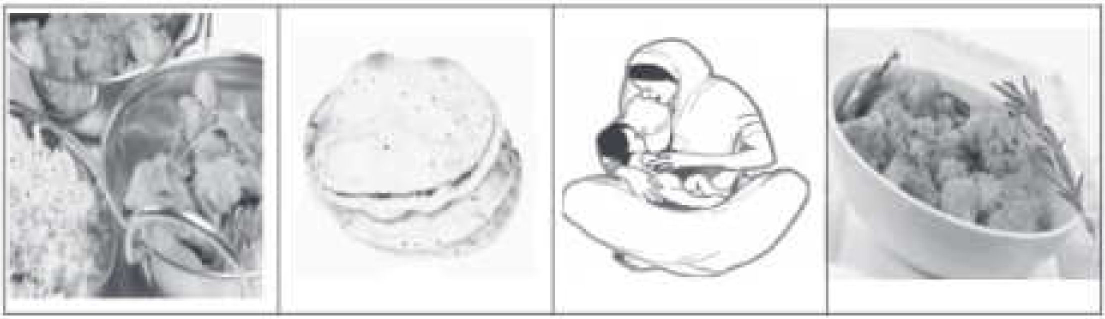

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- মেনু পরিকল্পনার নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন ধাপে একটি শিশুর ১০০০ দিনের পুষ্টি পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- ওজনাধিক্য ও স্বল্প ওজনের শিশুদের সঠিক খাদ্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশুর অপুষ্টিজনিত রোগ ও রোগের লক্ষণ জেনে তার প্রতিকার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রোটিন, ক্যালরি, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- মৌসুম ও উৎসব অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন এবং সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব;
- পরিবারের খাদ্য নির্বাচন, ক্রয় ও প্রস্তুতে সতর্ক থাকতে এবং ভেজাল খাদ্য ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- ভেজাল খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের নাম, ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও এসব খাদ্য গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ করতে পারব;
- রান্নার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রান্নার সময় পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতা অবলম্বন করার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- রান্নার সময় বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্য পরিকল্পনা

পাঠ ১–খাদ্য পরিকল্পনা– মেনু পরিকল্পনার নীতি

কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। আকর্ষণীয়ভাবে সুষম খাবার পরিবেশন করার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ও লিখিত খাদ্য তালিকাকেই মেনু বলে। পরিবারের সদস্যদের সুষম আহার পরিবেশনের জন্য মেনু পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত। পরিবারে দৈনিক তিন বেলার খাদ্য ছাড়াও শিশুর পরিপূরক খাদ্য, রোগীর পথ্য, বিয়ে, জন্মদিন, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও মেনু পরিকল্পনা করেই খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন– ছাত্রাবাস, হাসপাতাল ও বিমান রন্ধনশালা, হোটেল এবং রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাপনায় খাদ্য তালিকা বা মেনু পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি। মেনু পছন্দমতো হলে খাওয়ার আগ্রহ জন্মে। খাদ্যের সঠিক রং ও আকৃতি, ভালো রান্না, সুন্দর পরিবেশন ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণে আকৃষ্ট করে। মেনু পরিকল্পনার মাধ্যমেই পুষ্টি সংবলিত আকর্ষণীয় খাবার পরিবেশন করা যায়। সুপরিকল্পিত মেনু পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে এবং খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের কাজ সুষ্ঠু ও সহজ করে। মেনু পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো দুইটি যথা–(১) খাদ্য গ্রহণকারীর চাহিদা এবং (২) রান্নার সুবিধা ।

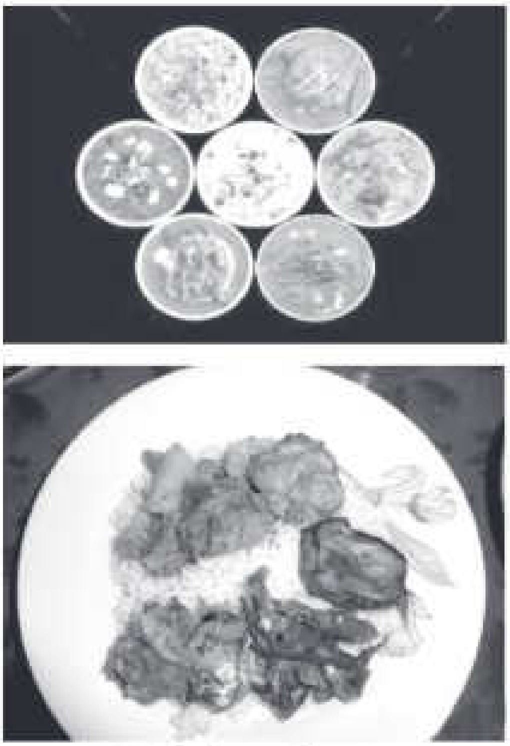

সুষম খাদ্য পরিবেশনে মেনু পরিকল্পনা

মেনু পরিকল্পনার সময়- বয়স, লিঙ্গভেদ, উপজীবিকা, আবহাওয়া, মৌসুম, পরিবেশনের ধরন, আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু খাবার, বাজেট, অভিজ্ঞ খাদ্য প্রস্তুতকারক, কাজ বণ্টন, উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার, তৈজসপত্র ও সরঞ্জাম, রেসিপির ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

মেনু পরিকল্পনার গুরুত্ব–

- সুষম খাদ্য পরিবেশন
- আকর্ষণীয়ভাবে খাবার পরিবেশন
- খাওয়ার আগ্রহ জন্মানো
- খাদ্য গ্রহণে একঘেয়েমি দূর করা
- অল্প খরচে বেশি পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা

মেনু পরিকল্পনার নীতি–

সুষম আহারের জন্য মেনু পরিকল্পনার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে–

- ৫টি মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী থেকে প্রতিদিনের খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।
- কমপক্ষে তিনটি খাদ্যগোষ্ঠী থেকে প্রতি বেলার খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। এছাড়াও প্রোটিন শ্রেণির খাদ্য থেকে যাতে প্রাণিজ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কমপক্ষে এক বেলার খাবারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, বিভিন্ন রং, আকার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।
- ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ বিবেচনা করে মেনু পরিকল্পনা করতে হবে।
- ব্যক্তিগত ও শারীরিক সমস্যা যেমন-শিশুদের ঝালযুক্ত খাবার না দেওয়া, বৃদ্ধ বয়সে নরম খাবার দেওয়া, ব্যক্তি বিশেষে অ্যালার্জিযুক্ত খাবার পরিহার করা ইত্যাদি মেনু পরিকল্পনার সময় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।
- রান্নার জন্য কতটা সময় ও শক্তি খরচ হবে তা মেনু পরিকল্পনার সময় দেখতে হবে। এমন খাদ্য তালিকা করা ঠিক হবে না যাতে করে অনেক বেশি সময় ও শক্তি খরচ হয়।
- খাদ্যের বাহ্যিক উপস্থাপনা এমন হবে যাতে খাবার দেখে খাওয়ার আগ্রহ নষ্ট না হয়ে যায়। মেনু পরিকল্পনার সময় খাদ্য পরিবেশনের ধরন কী হবে তা বিবেচনা করে মেনু পরিকল্পনা করলে খাদ্যের বাহ্যিক উপস্থাপনা আকর্ষণীয় হয়।

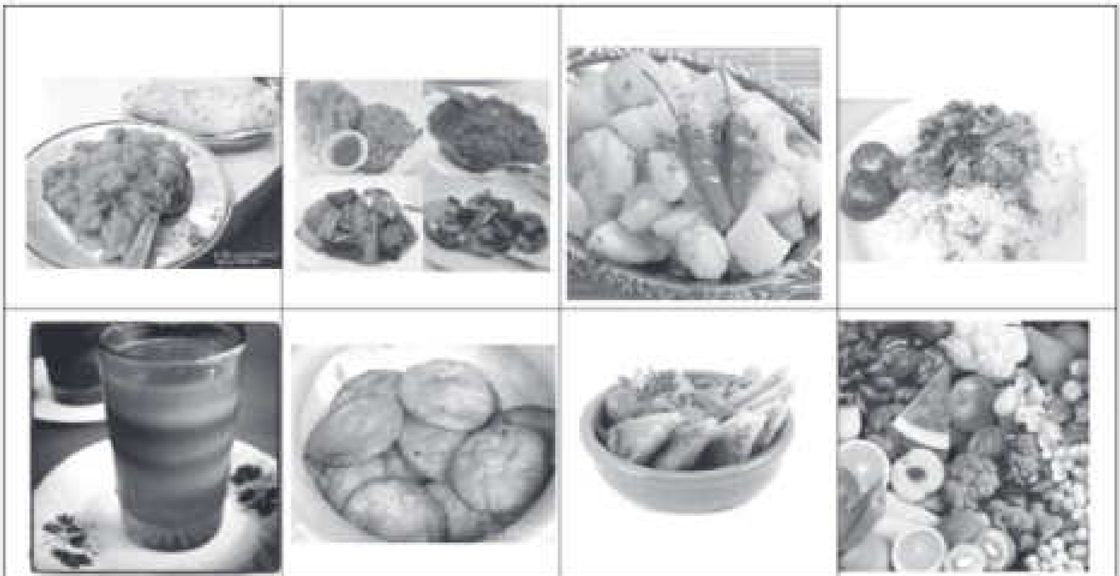

সঠিক মেনু পরিকল্পনার মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে খাদ্য পরিবেশন

- খাদ্যখাতে খরচের বিষয় বিবেচনা করে মেনু পরিকল্পনা করতে হবে। খাদ্য খাতে খরচের ২৫% মাছ, মাংস, ডিম ও ডাল কেনার জন্য ২০% দুধ, ২০% ফল ও সবজি, ২০% চাল, আটা ও বিস্কুট এবং ১৫% তেল ও চিনি কেনার জন্য ব্যয় করলে সুষম আহারের মেনু পরিকল্পনা করা সহজ হবে।

- খাবার যাতে একঘেয়ে না হয়ে যায় সেজন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের সমাহার ঘটাতে হবে এবং একটা খাবারের পরিবর্তে অন্য আর একটা খাবার খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

কাজ– তোমার পরিবারের জন্য মেনু পরিকল্পনায় সময় তুমি কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে?

পাঠ ২ – ১০০০ দিনের পুষ্টি (মাতৃগর্ভে অবস্থানকাল থেকে ২ বছর)

একটা শিশুর ১০০০ দিনের পুষ্টি বলতে মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে পুষ্টি ও জন্মের পরবর্তী দুই বছরের পুষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ এই সময়কালের পুষ্টি চাহিদাকে প্রধানত ২টি পর্বের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়–

১০০০ দিনের পুষ্টি = জন্ম পূর্ববর্তী সময়ের পুষ্টি (মাতৃগর্ভে ২৭০ দিন) + জন্ম পরবর্তী ২ বছর বয়সের পুষ্টি (৭৩০দিন)

একটা শিশুর জীবনের সুস্থ ভবিষ্যতের ভিত রচনার অন্যতম সময় হচ্ছে এই ১০০০ দিন। ১০০০ দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে এই সময়ের পুষ্টি চাহিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের সঠিক পুষ্টি শিশুর যথাযথ শারীরিক বর্ধন, মেধা বিকাশ এবং ভবিষ্যতের জন্য মেধাবী ও দক্ষ জাতি গঠনের হাতিয়ার। গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে শিশুর বর্ধন ও বিকাশ ব্যাহত হয়। এই সকল শিশু জন্মের পরও সহজেই অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। ফলে শারীরিক বর্ধনের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ব্যাহত হয় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। তাই শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের জন্য ১০০০ দিনের পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জন্ম পূর্ববর্তী সময়ের পুষ্টি – ১০০০ দিনের মধ্যে প্রথম প্রায় ২৭০ দিন একটি শিশু মায়ের গর্ভে অবস্থান করে। এই সময় শিশু তার সার্বিক বর্ধনের জন্য মায়ের পুষ্টির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকে। মায়ের শারীরিক অবস্থা শিশুর পুষ্টিগত অবস্থাকে সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে। শিশু মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে মা খাদ্য গ্রহণের ফলে যে পুষ্টি অর্জন করেন সেই পুষ্টি শিশুর দেহে স্থানান্তরিত হয়। তাই গর্ভবতী মায়ের যথাযথ পুষ্টি সাধনের ফলে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত হয়। যেহেতু শিশু মায়ের কাছ থেকে পুষ্টি লাভ করে তাই গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টি চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সময় মায়ের বর্ধিত পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী সুষম খাদ্য গ্রহণই শিশুর পুষ্টি সরবরাহকে নিশ্চিত করতে পারে। গর্ভাবস্থায় মায়ের শক্তি চাহিদা বাড়ে সেই সাথে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও বেড়ে যায় এবং এই সময় গর্ভবতী মাকে সব ধরনের খাবার একটু বেশি করে খেতে হয়।

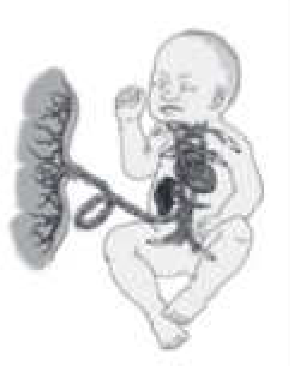

মায়ের গর্ভে শিশু মায়ের কাছ থেকে পুষ্টি পায়

২৭০ দিনের (গর্ভাবস্থায়) বর্ধিত পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য গর্ভবতী মাকে–

- প্রতিদিন তিন বেলা খাবারের সাথে নিয়মিত এক মুঠ করে বেশি খাবার খেতে দিতে হবে।
- ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, শাকসবজি, ঘন ডাল, হলুদ বর্ণের সবজি ও ফল এবং তেলেভাজা খাবার অথবা তেল একটু বেশি দিতে হবে।
- ৩ বেলা খাবারের পাশাপাশি আরও ২-৩ বার পুষ্টিকর নাশতা দিতে হবে।
- খাবারের সাথে একটা করে ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিড, লৌহ ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হয়।

জন্ম পরবর্তী ২ বছর বয়সের পুষ্টি – জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শিশুকে শুধু মায়ের বুকের দুধ পান করাতে হবে। দুধ ছাড়া কোনো ধরনের খাবার এমনকি পানিও দেওয়া যাবে না। ৬ মাস পর পুষ্টি চাহিদা আগের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় শুধু মায়ের বুকের দুধে শিশুর চাহিদা মেটে না তাই ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। জীবনের এই সময় অতি দ্রুত দেহের বৃদ্ধি ঘটে, মস্তিষ্কের বর্ধনও এই বয়সেই সম্পন্ন হয় তাই এই সময় পুষ্টির চাহিদার প্রতি অবশ্যই যত্নবান হতে হবে।

সময়	শিশুর জন্য ৭৩০ দিনের খাদ্যের ধরন	
জন্মের পর প্রথম ১৮০ দিন (জন্ম থেকে ৬ মাস) 		শিশুর জন্মের সাথে সাথে এক ঘন্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে মধু, চিনির পানি, পানি, তেল বা অন্য কোনো টিনের দুধ দেওয়া যাবে না। ২-৩ ঘন্টা পরপর দৈনিক ৮-১২ বার মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে।
১৮১ - ২৪০ দিন (৭-৮ মাস) 	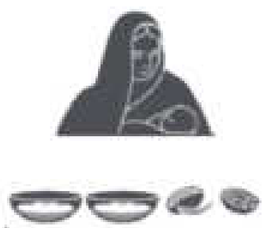	মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি পারিবারিক খাবার চটকিয়ে নরম করে ২৫০ মি. লি. বাটির আধ বাটি করে দিনে ২-৩ বার দিতে হবে। প্রতিদিন মাছ বা ডিম বা মুরগির কলিজা বা মাংস, ডাল, শাক, হলুদ সবজি ও ফল, তেল দিয়ে রান্না করা খাবার এবং গরুর দুধ দিয়ে তৈরি খাবার দিতে হবে।

২৪১-৩৩০ দিন (৯-১১ মাস) 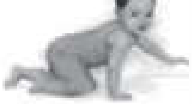	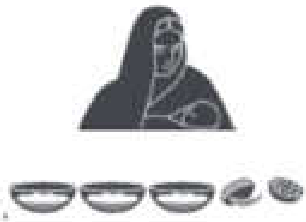	মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি পারিবারিক খাবার ২৫০ মি. লি. বাটির আধ বাটি করে দিনে ৩-৪বার দিতে হবে এবং ১-২বার ফলের রস দিতে হবে। প্রতিদিন মাছ বা ডিম বা মুরগির কলিজা বা মাংস, ডাল, শাক, হলুদ সবজি ও ফল, তেল দিয়ে রান্না করা খাবার, দুধ দিয়ে তৈরি খাবার ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
৩৩১-৭৩০ দিন (১২-২৪ মাস)		মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন মাছ বা ডিম বা মুরগির কলিজা বা মাংস, ঘন ডাল, শাক, হলুদ সবজি ও ফল, তেল দিয়ে রান্না করা খাবার, দুধ দিয়ে তৈরি খাবার ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ২৫০ মি. লি. বাটির এক বাটি করে দিনে ৩ বাটি খাবার ৩-৪বার দিতে হবে। এই সময় শিশুকে নিজে নিজে খেতে উৎসাহ দিতে হবে।

কাজ – দেড় বছরের শিশুর বিভিন্ন ধরনের খাদ্য এবং পরিমাণ কেমন হবে দেখাও।

পাঠ ৩– ৪ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুর খাবার

৪-৬ বছর বয়সের শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশু বলা হয়। এই বয়সে শারীরিক বর্ধন দ্রুত হলেও শৈশব কালের চেয়ে কিছুটা মন্থর গতিতে ঘটে। এই বয়সের শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং খেলাধুলা করে তাই এ সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে বলে শক্তির খরচ বেশি হয়। প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশুদের পেশির গঠন, দাঁত, হাড়, রক্ত গঠন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বড়দের তুলনায় বেশি হয়।

প্রাক-বিদ্যালয়গামী (৪–৬ বছর বয়সের) শিশুদের পুষ্টির গুরুত্ব —

- বয়স অনুযায়ী এই বয়সি শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত ক্যালরি ও প্রোটিনজাতীয় খাদ্য গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।
- শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ও খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। এজন্য কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও ধাতব লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি গুরুত্বপূর্ণ।

- লোহা ও ফলিক এসিড রক্ত গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়।
- ত্বক ও চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন- এ, বি ও সি সমৃদ্ধ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, ৪-৬ বছর বয়সের শিশুদের স্বাভাবিক ওজন, উচ্চতা, সুস্থতা, পড়ালেখা ও খেলাধুলার ক্ষমতা এবং দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন শিশুর খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদানেরই পর্যাপ্ত উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পেতে হলে মৌলিক খাদ্য গোষ্ঠীর প্রতিটি গ্রুপ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রতিদিনই নির্ধারিত পরিমাণে শিশুকে গ্রহণ করতে হবে। এ বয়সের শিশুদের খাদ্য তালিকা তৈরির সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন–

(ক) শিশুদেরকে প্রতিদিন কমপক্ষে তিন বেলা প্রধান খাবার ও দুইবার পুষ্টিকর নাশতা দিতে হবে। এই পুষ্টিকর নাশতা শিশুর স্কুলে থাকাকালীন একবার এবং বাসায় থাকাকালীন একবার দিতে হবে। তাহলে পুষ্টির অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

(খ) প্রতি বেলার প্রধান খাবারে অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতের বেলায় মৌলিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। যেমন–উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে।

(গ) প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের রঙিন শাকসবজি ও টকজাতীয় ফল এবং মৌসুমি ফল অবশ্যই থাকতে হবে।

(ঘ) প্রতি বেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালরি সমৃদ্ধ ও তরলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) অতিরিক্ত তেলে ভাজা ও মিষ্টি জাতীয় খাবার গ্রহণে সচেতন হতে হবে। যারা পরিশ্রমের কাজ করে না বা খেলাধুলা করে না তারা এই ধরনের ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ অবশ্যই পরিহার করবে। তা না হলে শিশুকালেই শরীরের ওজন বেড়ে যাবে অর্থাৎ ওজনাধিক্যে আক্রান্ত হবে।

৪-৬ বছর বয়সের শিশুদের উপযোগী খাদ্য

নিচে ৪-৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য একদিনের একটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো–

বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য	পরিবেশন পরিমাণ (নিচের যেকোনো একটি নির্ধারিত পরিমাণের খাবার ১ পরিবেশন)	পরিবেশন সংখ্যা
শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য	আধা কাপ ভাত একটি রুটি এক টুকরা পাউরুটি	৩-৪
প্রোটিনজাতীয় খাদ্য	একটি ডিম আধা কাপ রান্না মটরশুঁটি মাঝারি এক টুকরা মাছ বা মাংস এক কাপ মাঝারি ঘন ডাল আধা কাপ ঘন ডাল ১/৩ কাপ বাদাম	২-৩
শাকসবজি	এক কাপ কাঁচা সবজি / সালাদ আধা কাপ বিভিন্ন রান্না সবজি আধা কাপ রান্না শাক একটা আলু	৩-৪
ফল	একটি মাঝারি কলা / কমলা / পেয়ারা / আম অথবা আধা কাপ টুকরা ফল	৩-৪
দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য	এক কাপ দুধ বা দই	৩-৪
তেল, ঘি	৩ চা চামচ = ১৫ গ্রাম (১ চা চামচ = ৫ গ্রাম)	৩০-৪০ এম.এল. বা ৬-৮ চা চামচ
জ্যাম, জেলি, মিষ্টি, মধু কোমল পানীয়, চকলেট, বিস্কুট, আইসক্রিম ইত্যাদি	শিশুর শারীরিক কর্মক্ষমতা বা পুষ্টিগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের খাবার সংযোজন বা বিয়োজন করা যেতে পারে।	

কাজ – ৪-৬ বছর বয়সের শিশুদের উপযোগী একদিনের খাদ্য তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৪– ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুর খাবার

১১-১৫ বছর বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়গামী শিশু বলা হয়। এই বয়সে শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এই বয়সে দ্রুত লম্বা হয়। এই বয়সে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে পুষ্টির চাহিদা বেশি হয়। বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তির চাহিদা বাড়ে। এছাড়াও প্রোটিন, ভিটামিন ও ধাতব লবণের চাহিদাও বাড়ে। এই বয়সের শিশুরা খেলাধুলা করে তাই তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে বলে বেশি শক্তির খরচ হয়। বিদ্যালয়গামী শিশুদের পেশি, দাঁত, হাড়, রক্ত ইত্যাদির গঠনের জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেশি হয়।

বিদ্যালয়গামী (১১–১৫ বছর বয়সের) শিশুদের পুষ্টির গুরুত্ব –

- ১১-১৫ বছর বয়সের শিশুদের দ্রুত বর্ধন বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিনজাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ।
- বিদ্যালয়গামী শিশুদের শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, পড়ালেখা এবং বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি মেটানোর জন্য কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- ভিটামিন ও ধাতব লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বিদ্যালয়গামী শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি গুরুত্বপূর্ণ।
- ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লৌহ ও ফলিক এসিড বেশি প্রয়োজন হয়, কারণ মেয়েদের মাসিকের জন্য প্রতিমাসে যে রক্তের অপচয় ঘটে তা পরিপূরণের জন্য অর্থাৎ রক্ত গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়।
- ত্বক ও চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন- এ, বি ও সি সমৃদ্ধ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, ১১-১৫ বছর বয়সের শিশুদের স্বাভাবিক ওজন, উচ্চতা, সুস্থতা, পড়ালেখা, খেলাধুলার ক্ষমতা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদানেরই পর্যাপ্ত উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পেতে হলে মৌলিক খাদ্য গোষ্ঠীর প্রতিটি গ্রুপ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রতিদিনই নির্বাচন করতে হবে। এই বয়সি শিশুদের খাদ্য তালিকা তৈরির সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন–

(ক) ১১-১৫ বছর বয়সের শিশুদেরকে প্রতিদিন কমপক্ষে তিন বেলা প্রধান খাবার ও দুইবার হালকা নাশতা দিতে হবে। এই বয়সে শিশুরা বেশ দীর্ঘ সময় স্কুলে থাকে। স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা খেলাধুলাও করে থাকে, ফলে প্রচুর শক্তির খরচ হয়। তাই স্কুলে থাকাকালীন একবার এবং বাসায় আরও একবার পুষ্টিকর নাশতা দিতে হবে। তাহলে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

(খ) প্রতি বেলার প্রধান খাবারে অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতের বেলায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

(গ) প্রতিদিনই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। দিনে অন্তত একবার প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ও রঙিন যেমন– হলুদ, সবুজ, লাল, বেগুনি ইত্যাদি বর্ণের টাটকা শাকসবজি ও তাজা টকজাতীয় ফল অবশ্যই থাকতে হবে।

(ঙ) পর্যাপ্ত পরিমাণ তরলজাতীয় খাদ্য প্রতি বেলায় গ্রহণ করতে হবে।

(চ) মিষ্টিজাতীয় খাবার ও অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার গ্রহণে সচেতন হতে হবে। যারা পরিশ্রমের কাজ কম করে বা একেবারেই করে না বা খেলাধুলা করে না তারা এই খাদ্যগুলো গ্রহণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। তা না হলে শরীরের ওজন বেশি বেড়ে যাবে অর্থাৎ ওজনাধিক্যে আক্রান্ত হবে এবং নানা ধরনের জটিল রোগের সূচনা হবে।

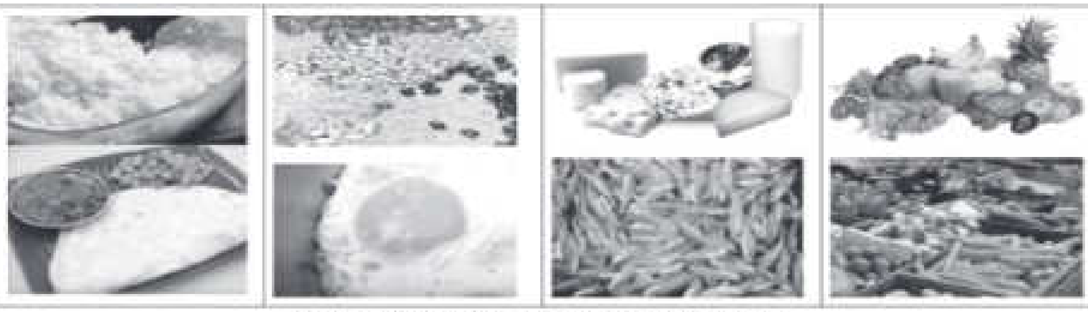

১১ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য

নিচে ১১-১৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য এক দিনের একটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো–

বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য	এক পরিবেশন পরিমাণ (নিচের যে কোনো ১টি নির্ধারিত পরিমাণের খাবার ১ পরিবেশন)	ছেলে (পরিবেশন)	মেয়ে (পরিবেশন)
শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য	আধ কাপ ভাত একটি রুটি এক টুকরা পাউরুটি	৮-৯	৬-৮
প্রোটিনজাতীয় খাদ্য	একটি ডিম আধা কাপ রান্না মটরশুঁটি মাঝারি এক টুকরা মাছ বা মাংস এক কাপ মাঝারি ঘন ডাল আধা কাপ ঘন ডাল ১/৩ কাপ বাদাম	৩-৫	৩-৪
শাকসবজি	এক কাপ কাঁচা সবজি সালাদ আধা কাপ বিভিন্ন রান্না সবজি আধা কাপ রান্না শাক একটা আলু	৪-৫	৩-৪
ফল	একটি মাঝারি কলা / কমলা / পেয়ারা / আম অথবা আধা কাপ টুকরা ফল	৩-৪	৩-৪
দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য	এক কাপ দুধ বা দই	২-৪	২-৪
তেল, ঘি	৩চা চামচ = ১৫ গ্রাম (১ চা চামচ=৫ গ্রাম)	৩০-৪০ এম.এল. বা ৬-৮ চা চামচ	৩০-৪০ এম.এল. বা ৬-৮ চা চামচ
মিষ্টিজাতীয় খাবার		কম পরিমাণে	কম পরিমাণে

কাজ – ১১-১৫ বছর বয়সের শিশুদের উপযোগী একদিনের খাদ্য তালিকা তৈরি করো

পাঠ ৫ –ওজনাধিক্য শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা

একবিংশ শতাব্দীতে শিশুদের ওজনাধিক্য একটা মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সমস্যাটি বর্তমানে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা বাড়ছে।

ওজনাধিক্য কাকে বলে?

এক কথায় ওজনাধিক্য হচ্ছে শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া। অর্থাৎ বলা যায় যে, কারও শরীরের ওজন যখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকে ওজনাধিক্য বলে। প্রত্যেক বয়সের জন্য স্বাভাবিক ওজনের নিম্ন সীমা ও উচ্চ সীমা আছে। দেহের ওজন যখন সেই বয়সের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই ওজনাধিক্য দেখা দেয়।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়ার ফলে ওজনাধিক্য হয়

ওজনাধিক্যের কারণ–

দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া। আমরা প্রতিদিন যদি ক্যালরিবহুল খাদ্য দেহের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গ্রহণ করি এবং পরিশ্রম কম করি ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করি তা হলে এই অতিরিক্ত ক্যালরি আমাদের দেহে ফ্যাট আকারে জমা হবে এবং ধীরে ধীরে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ওজনাধিক্য দেখা দিবে।

প্রতিদিন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং কম পরিশ্রম করা →	দেহের ওজন বৃদ্ধি →	অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি →	জীবনের ঝুঁকি বৃদ্ধি

শুধু খাদ্য গ্রহণ করলেই সুস্থ থাকা যাবে না। সুস্থ থাকতে হলে সুষম খাদ্য গ্রহণ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, খেলাধুলা ও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন।

ওজনাধিক্যের কুফল–

শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। যেমন–উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, পিত্তথলির পাথর, রক্তে চর্বির আধিক্য ইত্যাদি। এই কারণে শরীরের ওজন কোনোভাবেই বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। শিশুকালে ওজন বৃদ্ধি পাওয়া শরীরের জন্য একেবারেই ভালো লক্ষণ নয় কারণ এর ফলে অল্প বয়সেই বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

ওজনাধিক্য শিশুর খাদ্য ব্যবস্থা–

শরীরের ওজন বেশি হলে অবশ্যই খাদ্য সংক্রান্ত নিম্নলিখিত নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

- শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য যেমন–ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি নির্ধারিত পরিমাণে খেতে হবে। এই খাবারগুলো বেশি খেলে ওজন বেড়ে যাবে। মনে রাখতে হবে ভাত রুটির পরিবর্তে সমপরিমাণ পোলাও,

খিচুড়ি,পরোটা ইত্যাদি খাওয়া যাবে না। কারণ এই খাবারগুলোতে তেল বা ঘি থাকায় ভাত ও রুটির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়। তাই পোলাও, খিচুড়ি,পরোটা ইত্যাদি খেতে হলে ভাত ও রুটির অর্ধেক পরিমাণে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

ওজনাধিক্য শিশুর কম তেলযুক্ত খাবার

- প্রতিবেলার খাদ্য তালিকাতে যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজি, মৌসুমি ফল ও টক ফল থাকতে হবে। এই খাবারগুলো বেশি খাওয়া যাবে।
- প্রতিদিন প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য ডাল, বাদাম, মাছ, মাংস ও ডিম পরিমিত পরিমাণে খাওয়া যাবে।
- শিশুদের খাদ্য তালিকায় দুধ থাকা প্রয়োজন। তাই চিনি বা গুড় ছাড়া দুধ গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে এবং দুধের তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দিতে হবে।
- নাশতা হিসেবে সব সময় কম ক্যালরিযুক্ত খাদ্য যেমন–শাকসবজি ও ফল বাছাই করতে হবে। যে সকল খাদ্যে ক্যালরি বেশি থাকে সেই খাদ্য গ্রহণে শরীরের ওজন আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। তাই ক্যালরিবহুল খাদ্য যেমন– তেলে ভাজা-ভুনা খাদ্য, ঘি, মাখন, চিনি ও গুড় দিয়ে তৈরি মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, বেকারির তৈরি খাদ্য, কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট, সব ধরনের সফট ড্রিংকস, চকলেট, ক্যান্ডি, আইসক্রিম, ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।
- ওজন কমানোর জন্য শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম ও অন্যান্য খাবার রান্নার সময় অবশ্যই কম তেল দিয়ে রান্না করে খেতে হবে। তেলের ব্যবহার কমাতে হবে। অর্থাৎ রান্নার সময় খুব কম তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। ডুবো তেলে ভাজা সব ধরনের খাবার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।
- ক্ষুধা লাগলে বিভিন্ন ভাজা, প্যাকেটজাত ও বেকারির খাবারের পরিবর্তে মৌসুমি ফল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- সফট ড্রিংকস ও বোতলজাত কেনা জুসের পরিবর্তে ডাবের পানি ও রসালো ফল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এতে করে যেমন অর্থের সাশ্রয় হবে তেমনি বেশি পুষ্টি পাওয়া যাবে এবং শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

- মনে রাখতে হবে শরীরের বাড়তি ওজন কমানোর জন্য অবশ্যই নিয়মিত প্রতিদিন ব্যায়াম বা পরিশ্রম করতে হবে। পরিমিত আহারের পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম বা পরিশ্রম, নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন ও পর্যাপ্ত ঘুম এবং সর্বোপরি সার্বিক সচেতনতা শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

কাজ – দেহের ওজন কমানোর জন্য যে খাবারগুলো বাদ দিতে হবে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৬ – স্বল্প ওজনের শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা

শিশুদের শরীরের ওজন বেশি থাকা যেমন সমস্যা তেমনি ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকাও সমস্যা। কারণ এর ফলেও নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সমস্যাটি বর্তমানে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতেও দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা দেয়।

স্বল্প ওজন কাকে বলে?

এক কথায় স্বল্প ওজন হচ্ছে শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়া। অর্থাৎ বলা যায় যে, কারও শরীরের ওজন যখন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম হবে, তখন সেই অবস্থাকে স্বল্প ওজন বলা হবে। নির্দিষ্ট বয়সের জন্য স্বাভাবিক ওজনের নিম্ন সীমার চেয়ে যখন শিশুর ওজন কম হয় তখন তাকে স্বল্প ওজন বলা হয়।

স্বল্প ওজনের কারণ–

দেহের ওজন কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো প্রয়োজনের চেয়ে কম খাওয়া ও পরিশ্রম বেশি করা। আমরা প্রতিদিন যদি দেহের প্রয়োজনের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করি, পরিশ্রম বেশি করি এবং অনিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করি তাহলে ক্যালরি গ্রহণের চেয়ে ক্যালরি খরচ বেশি হবে। এর ফলে আমাদের দেহের সঞ্চিত শক্তি ফ্যাট ভেঙে শক্তির চাহিদা পূরণ হবে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে ধীরে ধীরে দেহের ওজন কমে যাবে। এভাবে দেহের ওজন কমে যাওয়ার ফলে স্বল্প ওজন দেখা দিবে। দীর্ঘদিন জটিল কোনো রোগে ভোগার পরও শরীরের ওজন কমে যেতে পারে।

• প্রয়োজনের তুলনায় কম ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ • পরিশ্রম বেশি করা • দীর্ঘদিন জটিল রোগে ভোগা →	দেহের ওজন কমে যাওয়া →	বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি →	জীবনের ঝুঁকি বৃদ্ধি

স্বল্প ওজনের কুফল –

শরীরের ওজন কম হলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন–

কর্মশক্তি কমে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সহজেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, মেধাশক্তি কমে যায় ইত্যাদি।

স্বল্প ওজনের শিশুর খাদ্য ব্যবস্থা–

শরীরের ওজন কম হলে অবশ্যই খাদ্য সংক্রান্ত নিম্নলিখিত নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

- শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন– ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। ভাত রুটির পরিবর্তে পোলাও, খিচুড়ি, পরোটা ইত্যাদি খাওয়া যাবে। এই খাবারগুলোতে তেল বা ঘি থাকায় ভাত ও রুটির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়। তাই ক্যালরি কম খাওয়ার কারণে যাদের শরীরের ওজন কমে যায়, তারা শরীরের ওজন বাড়ানোর জন্য ক্যালরিবহুল এই খাদ্যগুলো গ্রহণ করলে ক্যালরি অল্প খেলেও প্রয়োজনীয় ক্যালরি গ্রহণ করতে পারবে।
- প্রতিবেলার খাদ্য তালিকাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি ও মৌসুমি ফল থাকতে হবে।
- প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য ডাল, বাদাম, মাছ, মাংস ও ডিম অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে।
- খাদ্য তালিকায় দুধ ও দুধের তৈরি বিভিন্ন মিষ্টিজাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত করা ভালো। মিষ্টিজাতীয় খাবারগুলো থেকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি যথেষ্ট ক্যালরিও পাওয়া যাবে। যা শিশুদের ওজন দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করবে।
- যে সকল খাদ্যে ক্যালরি বেশি থাকে সেই খাদ্য গ্রহণে শরীরের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। তাই নাশতা হিসেবে গ্রহণের জন্য সব সময় বেশি ক্যালরিযুক্ত খাদ্য বাছাই করতে হবে।
- ওজন বাড়ানোর জন্য শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম ও অন্যান্য খাবার রান্নার সময় বেশি তেল দিয়ে রান্না করতে হবে।
- মনে রাখতে হবে শরীরের ওজন বাড়ানোর জন্য অবশ্যই নিয়মিত প্রতিদিন তিন বেলা খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি আরও দুইবার পুষ্টিকর নাশতা শিশুকে খেতে দিতে হবে।
- কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া বা প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়া যাবে না।
- ওজন বাড়ানোর জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত আহারের পাশাপাশি, পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন অবশ্যই প্রয়োজন।
- শারীরিক পরিশ্রম বাড়ালে ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণও বাড়াতে হবে। তা না হলে শরীরের ওজন কমে যাবে।
- শিশুর কোনো রোগের কারণে ওজন কম হলে অবশ্যই সেই রোগের চিকিৎসা করতে হবে।
- সর্বোপরি সার্বিক সচেতনতা শরীরের ওজন বাড়াতে সাহায্য করবে।

কাজ– স্বল্প ওজনের শিশুর ওজন বাড়ানোর জন্য কী ধরনের খাবার খেতে হবে বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শিশু নিচের কোন খাবারটি খাবে?

ক. চিনির পানি খ. মায়ের দুধ

গ. টিনের দুধ ঘ. খিচুড়ি

২. শরীরের ওজন বেশি হলে নিচের কোন খাদ্যটি বাদ দেওয়া উচিত?

ক. শাক খ. ভাত

গ. ডাল ঘ. পরোটা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জেরিনের ছেলে এবার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ছেলের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে জেরিন বেশ সচেতন। তাই ছেলেকে সে সবসময় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খেতে দেয়।

৩. জেরিন তার ছেলেকে প্রতিদিন কতবার প্রধান খাবার খেতে দেবে?

ক. দুইবার খ. তিনবার

গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

৪. জেরিনের ছেলেকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দেওয়ার কারণ–

i. হাড়ের সুগঠন

ii. মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিকাশ

iii. পেশির সুগঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাবেয়া খাতুনের পরিবারে প্রতিদিনের মেনুর পূর্ব পরিকল্পনার তেমন একটা রেওয়াজ নেই। বাড়তি ঝামেলার কথা চিন্তা করে শাকসবজি তেমন একটা রান্না করা হয় না। প্রতিবেলাতেই শুধু মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি রান্না করা হয়। সম্প্রতি তার পরিবারে নতুন অতিথির আগমনের কথা শুনে পুত্রবধূ নাঈমার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে বিশেষ একটি খাদ্য তালিকা করে দিলেন।

ক. কোন বয়সের শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশু বলা হয়?

খ. বিদ্যালয়গামী শিশুদের অধিক পুষ্টির প্রয়োজন কেন?

গ. নাঈমার জন্য আলাদা খাদ্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পরিবারের সকল সদস্যদের সুস্বাস্থ্যের জন্য রাবেয়া খাতুনের মেনু কতটুকু উপযোগী? মূল্যায়ন করো।

২. গার্মেন্টসকর্মী রেহানার ৯ বছর বয়সি ছেলের ওজন দিন দিন কমে যাচ্ছে। সে কোনো বেলাতেই পেট ভরে খাবার খায় না। সারাদিন ঝালমুড়ি, চানাচুর, চিপস ইত্যাদি খেতে বেশি পছন্দ করে। স্কুল থেকে ঘরে ফিরেই সে খেলতে চলে যায়। ইদানীং ক্লাসের পড়া শিক্ষক বুঝিয়ে দিলেও আগের মতো সে ভালোভাবে বুঝতে পারে না। স্কুলের পরীক্ষাগুলোতেও ধীরে ধীরে ভালো ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ক. ওজনাধিক্য কাকে বলে?

খ. মেনু বলতে কী বোঝায়?

গ. রেহানার ছেলের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস রেহানার ছেলের জন্য প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

অষ্টম অধ্যায়

অপুষ্টি

পাঠ ১ – প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টি

খাদ্যের কাজ হলো পুষ্টি সাধন করা। কিন্তু যদি কোনো কারণে দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত ক্যালরি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ না করা হয় বা যে খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে তার মধ্যে এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকে বা চাহিদা অনুযায়ী কম খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাহলে গৃহীত খাদ্য শরীরের চাহিদা মেটাতে পারবে না। তখন কিছুদিনের মধ্যেই এই পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাবে আমাদের শরীরে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তাদেরকেই অভাবজনিত রোগ বা অপুষ্টিজনিত রোগ বলে।

অপুষ্টিজনিত রোগগুলোর মধ্যে রাতকানা, রক্তস্বল্পতা, গলগণ্ড, রিকেট, অস্টিওম্যালেসিয়া, বেরিবেরি, পেলেগ্রা, স্কার্ভি উল্লেখযোগ্য।

প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টি – প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবে যে অপুষ্টি দেখা দেয় তাকে প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টি (Protein Calorie Malnutrition) বা পিসিএম (PCM) বলে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রধান অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে পিসিএম একটি সমস্যা। সাধারণত ২ ধরনের পিসিএম দেখা দেয়।

(১) কোয়াশিয়রকর বা গা ফোলা রোগ–

সাধারণত ১-৪ বছর বয়সের শিশুরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাবে কোয়াশিয়রকর বা গা ফোলা রোগ দেখা দেয়।

কারণ –

(ক) মা বারবার গর্ভবতী হলে কোলের শিশুকে বুকের দুধ থেকে সরিয়ে দিয়ে কার্বোহাইড্রেটবহুল খাদ্যে অভ্যস্ত করলে খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হয়। ফলে কোয়াশিয়রকর দেখা দেয়।

(খ) ডায়রিয়া, হাম ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হলে অসুস্থতার সময় এবং রোগ ভোগের পরে দীর্ঘদিন পুষ্টিকর খাদ্য হতে বঞ্চিত হলে শিশুর দেহে প্রোটিনের ঘাটতির ফলে কোয়াশিয়রকর হয়।

লক্ষণ–

- স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পানি জমার পরও শরীরের ওজন কমে যায়।
- হাত, পা ও মুখে পানি জমে।
- ত্বক ফেটে যেতে পারে ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

- চুল পাতলা, বিবর্ণ ও দুর্বল গোড়াযুক্ত হয়।
- মুখ ফুলে গোল হয়ে চাঁদের মতো দেখায়। একে "মুনফেস" বলে।
- শিশু সাধারণত উদাসীন থাকে, কোনো কিছুতেই উৎসাহ থাকে না।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।

(২) ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার রোগ—

সাধারণত জীবনের প্রথম ২ বছরে শিশুদের এই রোগ বেশি দেখা যায়। তবে যে কোনো বয়সেই হতে পারে। শিশুদের খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরির অভাব হলে ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার রোগ দেখা দেয়।

কারণ —

(ক) **খাদ্যের অপর্যাপ্ততা** – খাদ্যের অপর্যাপ্ততাই এর প্রধান কারণ। মায়ের দুধ কমে গেলে যদি পরিপূরক খাদ্য দেওয়া না হয় তাহলে দেহে প্রোটিন ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব ঘটে।

(খ) **সংক্রামক ব্যাধি** – বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে অথবা বারবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে এবং সেই সময় প্রয়োজনমতো খাবার গ্রহণ না করতে পারলে শিশু হাড্ডিসার রোগে আক্রান্ত হয়।

ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশু

লক্ষণ – (১) বয়সের তুলনায় শিশুদের শরীরের ওজন শতকরা ৬০ ভাগের নিচে নেমে যায়।

(২) হাত, পা ও মুখ শীর্ণ হয়ে, চামড়া কুঁচকিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তির মতো দেখায়।

(৩) অস্থির প্রকৃতির হয় ও দুর্দশাগ্রস্ত দেখায়।

(৪) পেটকে অনেকটা বাটির মতো দেখায়। এই অবস্থাকে "পট বেলি" বলে।

(৫) ক্ষুধা থাকে।

প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টিজনিত রোগের প্রতিকার— প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টির প্রতিকার করার জন্য —

(ক) ক্যালরি ও প্রাণিজ প্রোটিন সমৃদ্ধ যথাযথ পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে হবে। বারবার অল্প খাবার দিতে হবে। ধীরে ধীরে খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। অসুস্থতা বেশি হলে খাবার নরম করে রান্না করে বারবার দিতে হবে। দুই বছরের শিশুকে বাইরের খাদ্যের পাশাপাশি মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। নিয়মিত ভিটামিন ও খনিজ লবণের ট্যাবলেট দিতে হবে।

(খ) সংক্রামক রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টিজনিত রোগের প্রতিরোধ – প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টির প্রতিরোধ করার জন্য –

(১) ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ৬ মাস পূর্ণ হলে বুকের দুধের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর পারিবারিক খাবার দিতে হবে। ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন দিতে হবে, পাশাপাশি অন্যান্য খাবারও দিতে হবে।

(২) সংক্রামক রোগ হলে চিকিৎসা করতে হবে এবং সেই সাথে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

(৩) নিয়মিত শিশুর ওজন নিতে হবে এবং তা রেকর্ড করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্বোত্তম পন্থা।

কাজ– ম্যারাসমাস ও কোয়াশিয়রকরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

পাঠ ২ – বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

আমরা জানি যে, খাদ্যের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনগুলো আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে। এই ভিটামিনগুলোর অভাবে আমাদের নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যাগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে নিচের ছকে দেওয়া হলো।

পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ	লক্ষণ	কারণ	প্রতিকার	প্রতিরোধ
ভিটামিন এ	রাতকানা ও বিভিন্ন ধরনের চোখের রোগ	রাতকানা হলে রাতের বেলা অল্প আলোতে দেখতে পায় না। এছাড়া ভিটামিন এ'র অভাবে চক্ষু শুষ্কতা দেখা দেয়, চোখে সাদা দাগ (বিটট স্পট) হয়।	দীর্ঘদিন খাদ্য তালিকায় দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, হলুদ ও কমলা বর্ণের শাকসবজি ও ফল ইত্যাদি খাদ্য অনুপস্থিত থাকা।	ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং এর পরিপূরক ক্যাপসুল নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।	প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, হলুদ ও কমলা বর্ণের শাকসবজি ও ফল গ্রহণ করতে হবে।

ভিটামিন বি	শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, ওজন হ্রাস ও দুর্বলতা।	হাত, পা অবশ হয়ে যায়। স্নায়ুতন্ত্র পীড়িত হয়।	খাদ্য তালিকায় ঢেঁকিছাটা চাল, আটা, ছোলার ডাল, বাদাম ইত্যাদি অভাব থাকা।	ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাদ্য এবং এর পরিপূরক ক্যাপসুল নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।	প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢেঁকিছাটা চাল, আটা, ছোলার ডাল, সয়াবিন, মটর ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
ভিটামিন সি	ভিটামিন সি – এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এ রোগ যেকোনো বয়সেই হতে পারে।	দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠে এবং দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে।	দীর্ঘদিন খাদ্য তালিকায় আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, লেবু, টমেটো ইত্যাদির অনুপস্থিত থাকা।	ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য এবং এর পরিপূরক ট্যাবলেট নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।	প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
ভিটামিন ডি	ছোটদের রিকেট ও বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া	শিশুদের রিকেট হলে হাড় নরম ও হালকা হয়, পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়, মাথার খুলি বড় হয়ে যায় এবং বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া হলে হাড় নরম, ঝাঁজরা ও ভঙ্গুর হয়, সহজেই হাড় ভেঙ্গে যায়।	দীর্ঘদিন খাদ্য তালিকায় দুধ, দুধের তৈরি খাদ্য, ডিম, মাখন, কলিজা ইত্যাদি ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য অনুপস্থিত থাকলে, সূর্যের আলো গায়ে না লাগলে অথবা বিপাকজনিত ত্রুটির কারণে	ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং এর পরিপূরক ক্যাপসুল নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে, প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকতে হবে।	প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, দুধের তৈরি খাদ্য, ডিম, মাখন, কলিজা, কাঁটাসহ ছোট মাছ ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম ও কার্যকর। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো।

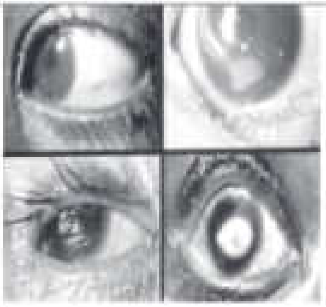

ভিটামিন এ'র অভাবজনিত চোখের বিভিন্ন রোগ

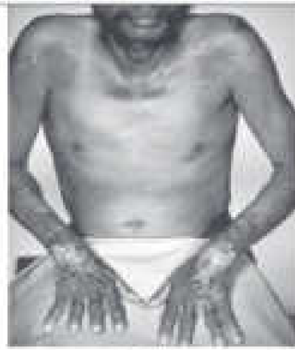

পেলেগ্রা

রিকেটস

পাঠ ৩ – খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ

বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপস্থিত থাকে যা গ্রহণের পর আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। এই খনিজ লবণগুলোর অভাবে আমাদের নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খনিজ লবণের অভাবজনিত সমস্যাগুলো নিচের চিত্রে দেওয়া হলো।

আয়োডিনের অভাবে গয়টার

উপরে একই বয়সের চারজন ব্যক্তি। এদের মধ্যে দুই পাশে স্বাভাবিক উচ্চতার দুইজন ব্যক্তির মাঝখানে আয়োডিনের অভাবে সৃষ্ট ক্রেটিনিজমে (হাবাগোবা ও বামনত্ব) আক্রান্ত দুইজন ব্যক্তি

	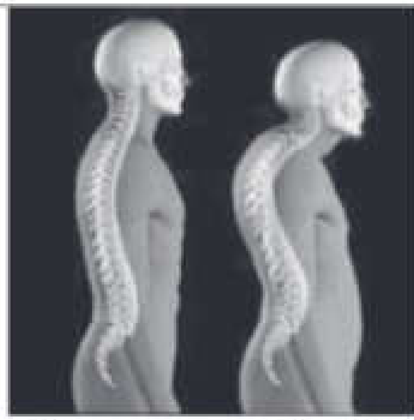
ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের রিকেট্স	ক্যালসিয়ামের অভাবে বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খনিজ লবণের অভাবজনিত সমস্যার কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে নিচের ছকে দেওয়া হলো।

পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ	লক্ষণ	কারণ	প্রতিকার	প্রতিরোধ
ক্যালসিয়াম	শিশুদের রিকেট ও বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া	শিশুদের রিকেট হলে হাড় নরম ও হালকা হয়, পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়, মাথার খুলি বড় হয়ে যায় এবং বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া হলে হাড় নরম, ঝাঁজরা ও ভঙ্গুর হয়, সহজেই হাড় ভেঙে যায়।	দীর্ঘদিন খাদ্য তালিকায় দুধ, দুধের তৈরি খাদ্য, কাঁটাসহ ছোট মাছ ইত্যাদি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য অনুপস্থিত থাকলে অথবা বিপাক জনিত ত্রুটির কারণে	ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং এর পরিপূরক ট্যাবলেট নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।	প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, দুধের তৈরি খাদ্য, কাঁটাসহ ছোট মাছ ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

লৌহ	রক্তস্বল্পতা	রক্তস্বল্পতা হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়, গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ঠোঁট, জিহ্বা, হাতের তালু ও নখ ফ্যাকাশে দেখায়, শারীরিক দুর্বলতা দেখা যায়, মাথা ঘোরে ও অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত বোধ হয়।	দীর্ঘদিন খাদ্য তালিকায় কলিজা, মাংস, ডিম, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদি লৌহ সমৃদ্ধ খাদ্য অনুপস্থিত থাকলে, ঘন ঘন সন্তান ধারণের ফলে লৌহের অভাব ঘটলে, শিশুকে ৬ মাস বয়সের পর বাড়তি খাদ্য না দিলে অথবা পেটে কৃমির সংক্রমণ ঘটলে।	লৌহ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং এর পরিপূরক ট্যাবলেট নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।	প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে কলিজা, মাংস, ডিম, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদি লোহা সমৃদ্ধ খাদ্য থাকতে হবে।
আয়োডিন	গয়টার ও ক্রেটিনিজম (হাবাগোবা ও বামনত্ব)	শিশুদের গয়টার হলে গলার সামনে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যায়, যাকে গয়টার বলে। এছাড়াও ক্রেটিনিজম (হাবাগোবা ও বামনত্ব) দেখা দিতে পারে।	দীর্ঘদিন খাদ্য তালিকায় আয়োডিনের অভাবজনিত খাদ্য গ্রহণ।	আয়োডিন সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং এর পরিপূরক ট্যাবলেট নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে।	খাদ্য তালিকায় সামুদ্রিক মাছ রাখতে হবে, আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে রান্না করতে হবে।

যেকোনো অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিকারের চেয়ে অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ হয়।

কাজ– আয়োডিনের অভাবে কী ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে? তোমার পরিবারের জন্য কীভাবে এই সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোয়াশিয়রকর রোগের অপর নাম কী?

ক. টিলেসিস খ. পেলেগ্রা
গ. পা ফোলা ঘ. হাড্ডিসার

২. নিচের কোনটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল?

ক. কলা খ. কাঁঠাল
গ. পেয়ারা ঘ. তরমুজ

নিচের উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জহুরার ৬ বছরের ছেলেটির পা দুইটি ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মাথাটাও বাক্সের মতো দেখায়। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে জানতে চাইলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন।

৩. জহুরার ছেলের কোন রোগটি হয়েছে?

ক. পেলেগ্রা খ. রিকেট
গ. বেরিবেরি ঘ. গয়টার

৪. জহুরার ছেলের জন্য করণীয়–

i. ছোট মাছ ও দুধ খাওয়ানো
ii. চিনি ও রুটি খাওয়ানো
iii. প্রতিদিন সূর্যালোকে ১০ মিনিট বসানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শ্রমজীবী সালমার ৪টি সন্তান। সে সন্তানদের যত্নের ব্যাপারে তত মনোযোগী নয়। তার ছোট ছেলেটি প্রায়ই পেটের পীড়ায় ভোগে। ইদানীং সে অনেক শুকিয়ে গেছে। বাচ্চাটির শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে। পেট শরীরের ভিতর ঢুকে গর্ত হয়ে গেছে। সালমা ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বললেন একটু সচেতন হলে তার সন্তান এ রোগে আক্রান্ত হতো না।

ক. ভিটামিন ডি-এর অভাবে কোন রোগ হয়?
খ. অপুষ্টিজনিত রোগ বলতে কী বোঝায়?
গ. সালমার ছেলের কোন রোগ হয়েছে–ব্যাখ্যা করো।
ঘ. সালমার ছেলের রোগ সম্পর্কে ডাক্তারের মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

নবম অধ্যায়

পরিবারের জন্য খাদ্য নির্বাচন, ক্রয় ও প্রস্তুতে সতর্কতা

পাঠ ১– মৌসুম ও উৎসব অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন ও পরিবেশন

পারিবারিক খাদ্য পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবারের আয় অনুযায়ী সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন– খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা, আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু খাবার, বিশেষ দৈহিক চাহিদা ও অনুমোদিত পরিমাণ, পরিবেশনের ধরন ও সময়, মৌসুম ও আবহাওয়া, উপলক্ষ্য বা আনুষ্ঠানিকতা, আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির সুবিধা, রন্ধনকারীর দক্ষতা, সঠিক রেসিপির প্রয়োগ, উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

মৌসুম অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন–

যে ঋতুতে যে শাকসবজি ও ফলমূল পাওয়া যায় সেটিই তখনকার খাদ্য তালিকায় রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ ঋতুকালীন শাকসবজি, ফলমূল দামে সস্তা, পুষ্টি উপাদান বহুল এবং স্বাদে ও গন্ধে স্বকীয়তা থাকে।

মৌসুম/আবহাওয়া মানুষের খাদ্য গ্রহণ ও চাহিদার উপরও প্রভাব বিস্তার করে। যেমন– শীতপ্রধান অঞ্চলে মানুষের তাপশক্তি বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয়। অপরদিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তুলনামূলকভাবে কম খাদ্য শক্তি দেওয়া যেতে পারে। এজন্য শীত প্রধান দেশে মাখন, তেল, ডিম, কফি, কোকো ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

এছাড়া ঋতুভেদে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফলমূল আমাদের দেশে সহজলভ্য থাকে। তাই খুব সহজেই খাদ্য তালিকা সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়।

বিভিন্ন মৌসুমে সহজলভ্য ফলমূল ও শাকসবজি–

গ্রীষ্ম ও বর্ষা কাল	শীতকাল
আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, বেল, তরমুজ, বাঙ্গি, লেবু, লটকন, পেঁপে, আনারস, ঢ্যাঁড়স, ডাঁটা, বেগুন, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, পটল, মিষ্টিকুমড়া, চাল কুমড়া, শশা।	জলপাই, বরই, কামরাঙা, টমেটো, লালশাক, পালংশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সিম, লাউ ইত্যাদি।

উৎসব অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন

মেনু বা খাদ্য তালিকা তৈরি বা প্রতিদিনের খাদ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপলক্ষ্য একটি বড় ভূমিকা পালন করে। নিত্যদিনের খাদ্য ছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভিন্ন আয়োজনের সাথে বিশেষ ধরনের খাদ ব্যবস্থার প্রচলন আছে। ছোট বড় যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেনু একটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। কারণ উপলক্ষ্য ভেদে খাদ্য তালিকায় ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- বিয়ে, গায়ে হলুদ জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, মিলাদ, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন- ঈদ, পূজা পার্বণ এবং দেশীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন- পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও খাদ্য গ্রহণে ভিন্নতা দেখা যায়। ঘরোয়া উৎসবের খাদ্য পরিকল্পনা এবং ঘরের বাইরে উদ্‌যাপিত উৎসবের খাদ্য পরিকল্পনায়ও ভিন্নতা দেখা যায়। এছাড়া উৎসবের ধরন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের বয়স, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অনুযায়ী খাদ্য পরিকল্পনা ভিন্ন হয়।

পরিবেশনের সময়কাল এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন- মধ্যাহ্ন ভোজ, নৈশ ভোজ কিংবা বৈকালিক 'চা চক্র' ইত্যাদি।

উৎসবভেদে খাদ্য পরিকল্পনার ধরন

জন্মদিন	বিবাহ উৎসব	পিকনিক	মিলাদ
১) কেক	১) বিরিয়ানি/ পোলাও	১) পোলাও/বিরিয়ানি	১) বড় জিলাপি
২) কাবাব/ভেজিটেবল চপ	২) রোস্ট ৩) গরু/খাসির রেজালা	২) মুরগির রেজালা/রোস্ট	২) লাড্ডু/সন্দেশ
৩) পিঠা	৪) সবজি/নিরামিষ	৩) গরু/খাসির রেজালা	৩) সিঙ্গাড়া
৪) চটপটি	৫) সালাদ ৬) বোরহানি	৪) সালাদ	৪) নিমকি
৫) কোমল পানীয়	৭) দই/মিষ্টি	৫) দই/মিষ্টি/পানীয়	৫) কলা

পাঠ ২ খাদ্য পরিবেশন

খাদ্য পরিবেশন বলতে বোঝায় "কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে খাদ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা।" সুন্দর পরিবেশনের উপর খাদ্য গ্রহণের তৃপ্তি অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- টেবিল সার্ভিস, বুফে সার্ভিস, পাস-অন সার্ভিস, ট্রে সার্ভিস, প্যাকেট পরিবেশন ও পরিচারকের মাধ্যমে পরিবেশন। ঘরে বা বাইরে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনের ব্যবস্থা সুষ্ঠু হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থার ধরন অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও পরিবেশনের ভিন্নতার উপরেও নির্ভর করে।

বিভিন্ন পরিবেশন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পরিবেশন পদ্ধতিগুলো প্রধানত দুই ধরনের। যথা–

(ক) অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি – গৃহে, পিকনিক কিংবা ভ্রমণে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রযোজ্য।

(খ) আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি – নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিকল্পিত খাদ্য সামগ্রী আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করা হয়। যেমন- বিয়ে, বাৎসরিক প্রীতিভোজ, হোটেল রেস্তোরাঁ, অফিসিয়াল পার্টি, সেমিনার ইত্যাদি।

তবে আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ধরনের পদ্ধতির মিশ্রণ দেখা যায়। আমাদের দেশে বহু প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

গৃহে খাদ্য পরিবেশন

- গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী বা আপ্যায়নকারী স্বয়ং খাদ্য পরিবেশন করেন। এই ধরনের পরিবেশন পদ্ধতি আমাদের দেশে বেশি আন্তরিকতাপূর্ণ আপ্যায়ন বলে মনে করা হয়।
- পরিচারকের মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশনে অতিথি ও গৃহবাসী সবাই একসঙ্গে খাবার উপভোগ করার সুযোগ পান।

- ট্রে-পরিবেশন – বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল, অফিসের ক্যান্টিন, ক্যাফেটেরিয়াতে ট্রে পরিবেশনের প্রচলন দেখা যায়।
- প্যাকেট পরিবেশন – মিলাদ, সেমিনার, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্যাকেট খাবার পরিবেশন করা হয়। স্ন্যাক্স, লাঞ্চ প্যাকেট বা বাক্সে সহজে অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে পরিবেশন করা যায়।
- বুফে পরিবেশন – এই পদ্ধতিতে বাড়ির খোলা জায়গা/লন, বারান্দা, ড্রইংরুম ইত্যাদি একাধিক স্থানে একই সময়ে কয়েকটি টেবিলে একই ধরনের খাবার এবং খাবার গ্রহণের প্লেট, গ্লাস, চামচ, কাপ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়। টেবিলের দুইপাশে অথবা টেবিলের চারপাশে একইভাবে খাবারগুলো সাজালে যে কোনো পাশ থেকে অতিথিরা প্রত্যেক প্রকার খাবার প্লেটে নিয়ে স্বাধীনভাবে জায়গায় বসে আনন্দের সাথে তা উপভোগ করতে পারেন, এই ধরনের পদ্ধতিকে স্ব-পরিবেশনও বলা হয়।

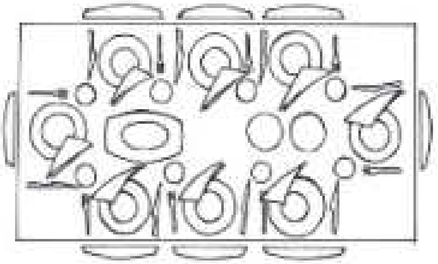

আনুষ্ঠানিক পরিবেশন

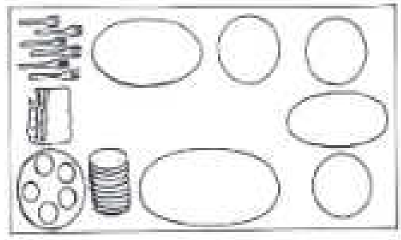

বুফে পরিবেশন

কাজ– মৌসুম ও উৎসব অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখো।

পাঠ ৩– খাদ্য ক্রয়ে সতর্কতা

পরিবারের সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয় এবং সে অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী নির্বাচন ও ক্রয় করতে হয়। বাজার থেকে কী ক্রয় করা হবে তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে কী খাবার রান্না হবে। কেননা অনেক সময় পরিবারের আর্থিক দিক বিবেচনা করে যা যা ক্রয়ের পরিকল্পনা থাকে যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। কাজেই পুষ্টি সম্পর্কে যদি পরিবারের সবাই সচেতন থাকেন এবং প্রতিটি বিষয়ে সহযোগিতা করেন তবেই পারিবারিক পুষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করা সহজ হয়। খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন যথাযথ এবং আকর্ষণীয় করার জন্য খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয় উল্লেখযোগ্য বিষয়। পছন্দসই সতেজ ও সরস খাদ্য নির্বাচন করা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য চাই অভিজ্ঞতা ও খাদ্য নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞান।

খাদ্য ক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এগুলো হচ্ছে–

- **খাদ্যের মান ও গুণ যাচাই করা**– এক্ষেত্রে উন্নত জাতের তাজা খাদ্য সামগ্রী এবং পুষ্টিমানের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যেমন– পচা ও বাসি মাছ, মাংস ক্রয় না করা। প্রয়োজনে বিকল্প খাদ্যসামগ্রী কিনে প্রয়োজন মেটাতে হবে।

- **দাম যাচাই করে কেনা**– বাজারে খাদ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতি হওয়াতে প্রায় প্রতিনিয়তই বাজারদর উঠানামা করে। তাই বিক্রেতার চাপে বিভ্রান্ত না হয়ে দাম যাচাই করে নেওয়াই ভালো।

- **খাদ্যদ্রব্য যাচাই-বাছাই করে ক্রয় করা**– দ্রব্যমূল্যের আধিক্য এবং নির্দিষ্ট বাজেট এই দুয়ের টানাপোড়েনে সস্তায় কেনার পরিবর্তে বাজারে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যাচাই-বাছাই করে ক্রয় করতে হবে। সস্তায় পচা খাবার ক্রয় থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। নিজের চাহিদামতো খাদ্যটি ক্রয়ে কিছুটা মূল্য বেশি দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত।

- **আয়ের মধ্যে ক্রয় করা–** আয়ের মধ্যে ক্রয় করাই নিরাপদ। এজন্য প্রায় একই মূল্যে বিকল্প কী কী কেনা যায়, কোনটির মূল্য কেমন ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রয়োজনে এসব বিষয়ে বাজারে আসার পূর্বেই তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে।

- **মাপ ও ওজনের প্রতি সতর্ক থাকা –** খাদ্য ক্রয়ে মাপ ও ওজনের জ্ঞান না থাকলে তা পুষ্টি চাহিদা পূরণেও ব্যর্থ হয়। তাই সঠিক মাপ ও ওজনে সতর্ক হতে হবে।

- **ঋতু অনুযায়ী সতেজ ও সজীব খাদ্য নির্বাচন –** ঋতুভেদে শাকসবজি যেমন সজীব ও তাজা থাকে তেমনি খাদ্য উপাদানও পর্যাপ্ত থাকে।

কাজেই ক্রয়ের জন্য এমন খাদ্য বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা পুষ্টি, রং, আকার এবং মানের বিচারে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। বাসি, পচা, পোকা খাওয়া জিনিস কখনো ক্রয় করা উচিত নয়। এতে যেমন খাদ্যের অপচয় হয় তেমনি অর্থেরও অপচয় হয়। উপরন্তু রন্ধনের বা সংরক্ষণের পরও খাদ্যবস্তুর স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ কিছুই সঠিক থাকে না। তাই খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্য থাকতে হবে।

কাজ– খাদ্য ক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বনের উপায় লেখো।

পাঠ ৪– খাদ্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সব প্রাণীরই খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রিত করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে। খাদ্যের মাধ্যমে শরীর নামক ইঞ্জিনটি সচল, ত্রুটিমুক্ত এবং কর্মক্ষম রাখার জন্য প্রত্যেক পরিবারেও চলে বিরামহীন প্রচেষ্টা। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, পরিতৃপ্তি ও চাহিদা অনুযায়ী বাজার থেকে দেখেশুনে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয়। তবে খাদ্য হিসেবে বাজার থেকে আমরা যে বস্তুসামগ্রী ক্রয় করে থাকি তা শতভাগ ভেজালমুক্ত পাওয়া কঠিন। কেননা এক শ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ী মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কাঁচা কিংবা রান্না করা খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করছে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক পচনশীলতা রোধ হয়, বাহ্যিকভাবে পরিপক্ব ও তাজা মনে হয় এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। যেমন– কাঁচা মাছ, মাংস, পাকা ফল সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। দুধ, চিনিতে সাদা ভাব আনার জন্য ব্যবহার করা হয় হাইড্রোজ। অপরিণত ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করা হয় কার্বাইড। বিভিন্ন খাবারকে আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম রং। এমনকি খাদ্যশস্য, ফলমূল, সবজি, ইত্যাদি উৎপাদনের সময়ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে মাঠ থেকে ফসল উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে খাবার তৈরির সময়ও ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ।

নিম্নে খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থসমূহ ছকের মাধ্যমে দেখান হলো–

খাদ্যের নাম	ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের নাম	উদ্দেশ্য
মাছ ও দুধ	ফরমালিন	পচনশীলতা রোধ করা ও দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখা
সবজি	কীটনাশক ও ফরমালিন	পোকা দমন ও সতেজ রাখা
জিলাপি, চানাচুর	মবিল	মচমচে করা ও স্বাদ বাড়ানো
সস্তামূল্যের বেকারি ফুড, আইসক্রিম, সুপ, সেমাই, নুডুলস, মিষ্টি ইত্যাদি	টেক্সটাইল ও লেদার ডাই হাইড্রোজ, এসিড	আকর্ষণীয় করার জন্য, সাদা ভাব আনার জন্য ও ঝাঁজালো করা
বিভিন্ন ফল	কার্বাইড, ফরমালিন, ইথোফেন	পাকানো ও পচন রোধ
মুড়ি	হাইড্রোজ, ইউরিয়া	চকচকে, সাদা ও ফুলে-ফেঁপে বড় করা

রাসায়নিক উপাদান দ্বারা দূষিত খাদ্য খাওয়ার ফলে আজ আমাদের জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক সুস্থতা ঝুঁকির মুখে পতিত হয়েছে। বর্তমানে হৃদ্‌রোগ, লিভার ও কিডনি রোগ এবং ক্যান্সারের প্রকোপ বেড়েছে। মানবদেহে গ্যাস্ট্রিক আলসার, পাকস্থলি ও অন্ত্রনালির প্রদাহ, অরুচি, ক্ষুধামন্দা, লিভার সিরোসিস, কিডনির সমস্যা ইত্যাদি কঠিন ব্যাধি বাসা বাঁধছে। রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহারে প্রাকৃতিক পরিবেশও দূষিত হচ্ছে।

কাজ– খাদ্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থসমূহের নাম লেখো।

পাঠ ৫– খাদ্যে ভেজালের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়

আমরা সকলেই প্রতিদিন বাজার থেকে কিছু না কিছু পণ্য ক্রয় করছি এবং বিভিন্নভাবে বিক্রেতা দ্বারা প্রতারিত হচ্ছি। বিক্রেতা পণ্য বিক্রয়ের সময় হয় ওজনে কারচুপি করছে অথবা অনেক জিনিসের সাথে খারাপ কিছু মিশিয়ে ক্রেতার কাছে বিক্রয় করছে। কিছু কিছু বিক্রেতা এমন অনেক পণ্য বাজারে বিক্রয় করছে যা মানুষের জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। এর কারণ হচ্ছে– কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অসৎ উদ্দেশ্যে কাঁচা কিংবা রান্না করা খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য অখাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করছে। যেমন– কাঁচা মাছ, পাকা ফল সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। মুড়ি আরও সাদা এবং আকারে বড় করার জন্য ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া। ওজন বাড়ানোর জন্য চাল, ডাল, মশলা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ইট, বালু, কাঠের গুঁড়া,

পাথরের মতো অখাদ্য উপাদান মিশ্রিত করা হয়। এছাড়াও খাদ্যবস্তুর বাহ্যিক আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহার করা হয়। যেমন–

- ময়দায় সাদা ভাব আনার জন্য কৃত্রিম পাউডার ব্যবহার করা হয়।
- রান্নার মশলায় কাঠ, বালি, ইটের গুঁড়া এবং বিষাক্ত গুঁড়া রং ব্যবহার করা হয়।
- চা পাতায় কাঠের মিহি গুঁড়া মেশানো হয়।
- ভাজার জন্য পামওয়েল, পশুর চর্বি কিংবা অন্য গলনশীল চর্বি ব্যবহার করা হয়।
- মাখন, মেয়নেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় অপরিশোধিত সস্তা চর্বি।
- মাংসের কিমারূপে গরু, ছাগলের অব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট অংশ ব্যবহার করা হয়।

এভাবে চাল, ডাল, তেল, লবণ থেকে শুরু করে শাকসবজি, ফলমূল, শিশুখাদ্য সবকিছুতেই ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। ভেজাল মেশানো এসব খাবার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এসব খাদ্য গ্রহণের ফলে ডায়রিয়া, বদ হজম, বমি, কিডনি, লিভারের সমস্যা, ক্যান্সারের মতো মরণ ব্যাধিসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীর রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। চিকিৎসকগণ মনে করেন ভেজাল মিশ্রিত খাবার এক ধরনের Slowpoison। কেননা প্রতিদিন আমরা নিজের অজান্তে বিভিন্ন ধরনের ভেজাল মিশ্রিত খাবার গ্রহণ করছি। যা আমাদের শরীরে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে। এর ফলে বেড়ে যাচ্ছে নতুন নতুন রোগ ও আক্রান্তের সংখ্যা। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

প্রতিরোধ ও করণীয়

- ভেজাল প্রতিরোধের জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।
- সরকারের ভেজাল বিরোধী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে আমাদের সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।
- ভেজালের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে।
- ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবগত করতে হবে।
- ভেজাল বিরোধী প্রচারণা বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরের মানুষের এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা নিতে হবে।
- সর্বোপরি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও গ্রহণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কাজ– ভেজালের প্রভাব ও প্রতিরোধ সম্পর্কে লেখো।

পাঠ ৬– পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে শাকসবজি, মাছ–মাংস কাটা–ধোয়া ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

আমরা যেসব খাদ্যদ্রব্য খাই তার মাত্র কয়েকটি যেমন– অধিকাংশ ফল, কিছুসংখ্যক সবজি, বাদাম, খেজুরের রস ইত্যাদি বাদে বাকি সবগুলো সংগ্রহের পর কোনো না কোনোভাবে খাওয়ার উপযোগী করে প্রস্তুত করে নিতে হয়। প্রস্তুত প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ ও পুষ্টিমান প্রভাবিত হয়।

কাঁচা খাদ্যদ্রব্য থেকে ভোজ্য দ্রব্য তৈরিতে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ধাপের সংখ্যা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট খাদ্যের ভৌত অবস্থা, রাসায়নিক গঠন এবং ভোজ্যদ্রব্যের চাহিদার উপর।

খাদ্যের কাঁচামাল থেকে ভোজ্য দ্রব্য তৈরি করতে সাধারণত যে ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয় সেগুলো হলো–

- খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার করা বা ধোয়া
- বর্জনীয় অংশ অপসারণ
- যথাযথ আকার ও আকৃতিতে টুকরা করা
- গুঁড়া করা
- রান্না করা

শাকসবজি, মাছ ও মাংস আমাদের দেহে পুষ্টি উপাদান সরবরাহের অন্যতম উৎস। আলু, মুলা, বীট, গাজর, বাঁধাকপি, পালংশাক, লালশাক, কলমিশাক ইত্যাদি শাকসবজি আমাদের দৈনন্দিন আহারের অপরিহার্য উপকরণ। শাকসবজির পাশাপাশি মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপাদানের অন্যতম উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শাকসবজি, মাছ, মাংস থেকে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও প্রোটিন পেয়ে থাকি। খাদ্যদ্রব্য থেকে ভোজ্য দ্রব্য তৈরির সময় ধোয়া, কাটা কিংবা প্রস্তুত করণের ত্রুটির জন্য কাম্য পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শাকসবজি, মাছ, মাংস পুষ্টিসম্মত উপায়ে কাটা ও ধোয়ার লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে–

- সব রকম শাকসবজি ও ফল কাটার আগেই পানি দিয়ে ধোয়া।
- পাতা সবজি যেমন– লালশাক, পালংশাক ইত্যাদির মাটি যুক্ত শিকড়ের অংশ ফেলে পাতাগুলো ধুয়ে নিয়ে পরে কাটতে হয়।
- খোসাযুক্ত সবজিগুলো যথাসম্ভব খোসাসহ বড় বড় টুকরা করে কাটতে হয়। কেননা খোসার ঠিক নিচেই থাকে ভিটামিন সি।
- শাকসবজি কাটার পর পানিতে ভিজিয়ে রাখা উচিত নয়। এতে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি-এর অপচয় হয়।
- শাকসবজি কেটে ফেলে রাখলে বাতাসের সংস্পর্শে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই রান্না করার কিছুক্ষণ আগেই কাটার কাজ সেরে নেওয়া ভালো।
- মাছ ও মাংস দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য। তাই ক্রয় করার পরপরই অখণ্ড অবস্থায় প্রথমে ধুয়ে নিলে ধুলাবালিসহ অনেক ময়লা দূর হয়।
- মাছ ও মাংসের বর্জনীয় অংশ বাদ দিয়ে সঠিক নিয়মে কেটে নিতে হয়।
- মাছ ও মাংস কাটার পর পরিষ্কার করে পানিতে ভিজিয়ে রাখা উচিত নয়, এতে পুষ্টিমান নষ্ট হয়।
- কাটা ও ধোয়ার পর অল্পসময়ের ব্যবধানে রান্নার কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

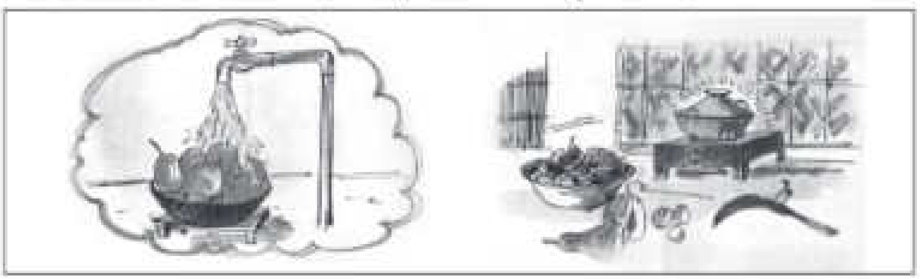

ফলমূল ও শাকসবজি কাটার আগে ধুতে হয়

কাজ– কাটা ও ধোয়ার সময় কীভাবে পুষ্টিমূল্য রক্ষা করা যায় লেখো।

পাঠ ৭ – খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

নানাবিধ প্রক্রিয়ায় খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করা, পরিপাক ও শোষণযোগ্য করা, ক্ষতিকর উপাদান থেকে রক্ষার জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি খাদ্যশিল্পে প্রয়োগ করা হয় তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো–

১. খাদ্যকে ব্যবহার উপযোগী করা

২. পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধি করা

৩. স্বাদ বৃদ্ধি করা

৪. অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা

৫. এক মৌসুমের খাবার অন্য মৌসুমে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা

৬. নতুন ধরনের খাবার তৈরি করা

প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি–

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কিছু প্রধান পদ্ধতি যা বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো–

- Heating/তাপপ্রয়োগ
- Cooling/Freezing/Chilling/শীতলীকরণ, ঘনত্ব বৃদ্ধি ও বাষ্পায়ন
- Fermentation/গাঁজন
- Irradiation/তেজস্ক্রিয়তা
- Microwave-এর ব্যবহার

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি–

১) **পাত্র নির্বাচন–** প্রথমে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাত্র নির্বাচন করতে হবে। পাত্রটিকে তার ধর্ম অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।

২) **খাদ্য নির্বাচন–** ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রথমেই পরিপক্ব, তাজা, নিখুঁত ও উচ্চমানের ফল বা সবজি সংগ্রহ করা হয়। এরপর আকার, আকৃতি, রং, পরিপক্বতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে grading করা হয়।

৩) **ধোয়া–** এই ধাপে প্রধানত নির্বাচিত খাদ্য পানিতে ডুবিয়ে বা ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। এর ফলে ফল বা সবজিতে লেগে থাকা ধুলাবালি, ময়লা, জীবাণু অপসারিত হয়।

৪) **খোসা ছাড়ানো–** বেশিরভাগ ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের আগে খোসা ছাড়ানো হয়। এ উদ্দেশ্যে গরম পানিতে ১-২ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়।

৫) **কাটা–** খোসা ছাড়ানোর পর ফল বা সবজিকে সুবিধা ও পছন্দমতো সমান আকারে কেটে নেওয়া হয়।

৬) **তাপ দেওয়া–** কাটার পর ফল বা সবজিকে ফুটন্ত পানিতে ৫-১০ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে Blanching বলে। এর ফলে খাবারে উপস্থিত enzyme ধ্বংস হয়, খাবারের গন্ধ দূর হয়।

৭) **লবণ পানি বা সিরাপ ঢালা–** ফলের সাথে ১৭৫°-১৮০° ফা. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত চিনির সিরাপ এবং সবজির সাথে একই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত লবণ দ্রবণ দিয়ে can বা বোতল পূর্ণ করা হয়।

৮) **বায়ুশূন্যকরণ–** পাত্রে যে বায়ু থাকবে সেটাকে ভিতর থেকে বিশেষভাবে বের করে নিতে হবে। পাত্রের ঢাকনা আলগা করে দিয়ে ফুটন্ত পানিতে পাত্রের অংশ ডুবিয়ে উত্তাপ দিলে জলীয়বাষ্পের ঊর্ধ্বগতিতে পাত্রের ভিতরের বাতাস বের হয়ে যায়, ৮০° সে. হলে বাতাস সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসে।

৯) **ঢাকনা লাগানো–** বায়ুশূন্যকরণের পর মেশিনের সাহায্যে হাত না লাগিয়ে পাত্রের মুখ সম্পূর্ণ বায়ু নিরোধকভাবে বন্ধ করতে হবে।

১০) **নির্বীজনকরণ–** বন্ধ টিনের কৌটাকে sterilizer-এর মধ্যে স্টিমের সাহায্যে ৩০-৪০ মিনিট ধরে তাপ দেওয়া হয়। ফলের ক্ষেত্রে ১০০° সে. ও সবজির ক্ষেত্রে ১১৬° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন। তাপ দেওয়া শেষ হলে সাথে সাথে পানিতে ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয়।

১১) **মোছা–** স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে শুকনা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে। যদি পাত্রের গায়ে পানি থাকে তবে মরিচা ধরার সম্ভাবনা থাকে।

১২) **লেবেল লাগানো ও গুদামজাতকরণ–** লেবেলে যাবতীয় প্রয়োজনাদি লেখা থাকে। যেমন– খাদ্যের নাম, পরিমাণ, উপকরণ, সংরক্ষণের তারিখ ও মেয়াদকাল ইত্যাদি লেবেল লাগানোর পর পাত্রগুলোকে উপযুক্ত পরিবেশে গুদামজাত করতে হয়।

পাত্র নির্বাচন ⟶ খাদ্য নির্বাচন ⟶ ধোয়া ⟶ খোসা ছাড়ানো ⟶ কাটা ⟶ তাপ দেওয়া ⟶ লবণ পানি বা সিরাপ ঢালা ⟶ বায়ুশূন্যকরণ ⟶ ঢাকনা লাগানো ⟶ নির্বীজনকরণ ⟶ মোছা ⟶ লেবেল লাগানো ⟶ গুদামজাতকরণ

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপ

এছাড়াও গৃহে আমরা রান্নাকরা খাবার এবং নিখুঁত, দাগমুক্ত ফল বা সবজি ০° সে. থেকে −৫° সে. তাপমাত্রায় ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারি। মাছ, মাংস, সবজি, ফল ইত্যাদি পচনশীল খাদ্য ডিপফ্রিজের বরফ চেম্বারে -১৮° সে. থেকে -৪০° সে. হিম ঠান্ডায় জমিয়ে ৬/৭ মাস পর্যন্ত রাখা যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সবজি ও ফলমূল

হিমাগারে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। অণুজীব ও এনজাইম নিষ্ক্রিয় করার জন্য খাদ্যকে ফুটন্ত পানিতে (৮০° সে. উর্ধ্বে) ভাপে ২-৩ মিনিট তাপ দিয়ে নিতে হয়। তারপর গরম পানি থেকে সাথে সাথে হিমশীতল পানিতে ডোবাতে হবে। তারপর সবজিটি (যেমন– ফুলকপি/টমেটো/মটরশুঁটি) ঠান্ডা করে সম্পূর্ণরূপে পানি ঝরিয়ে পলিথিন ব্যাগে বাতাস বন্ধ করে জমাটভাবে বরফের চেম্বারে রাখতে হবে। এভাবে প্রায় ৫/৬ মাস রাখা যায়। এতে রং, বর্ণ, গন্ধ নষ্ট হয় না। গৃহে এভাবে সংরক্ষিত খাদ্য যথাসম্ভব ছোট ছোট প্যাকেটে রাখাই ভালো। এতে একবার যে প্যাকেট খোলা হবে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার হয়ে যায়। তা না হলে বরফে সংরক্ষিত খাবারটির অতিরিক্ত অংশ বাতাসের সংস্পর্শে এসে দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাজ– ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির ধাপগুলো লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাছের পচনশীলতা রোধে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান কোনটি?

ক. মবিল খ. কার্বাইড

গ. হাইড্রোজ ঘ. ফরমালিন

২. নিচের কোন সবজিটি রান্না না করেই খাওয়া যায়?

ক. আলু খ. গাজর

গ. বরবটি ঘ. বেগুন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তাসনিমের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার মা তাসনিমের কিছু বান্ধবী ও আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত করলেন। অতিথির সংখ্যা বেশি হওয়ায় তিনি বসার ঘর ও খাবার ঘরে টেবিলে সব খাবার সাজিয়ে দিলেন। অতিথিরা নিজেদের পছন্দমতো খাবার নিয়ে কেউ সোফায় কেউবা চেয়ারে বা খাটে বসে খেয়ে নিল।

৩. তাসনিমের মা খাদ্য পরিবেশনের কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করলেন?

ক. বুফে খ. প্যাকেট

গ. টেবিল ঘ. পাস-অন

৪. ব্যবহৃত পরিবেশন পদ্ধতিটির সুবিধা হলো–

i. আপ্যায়নকারীর দরকার নেই

ii. অল্প জায়গায় অনেকে খেতে পারে

iii. অল্প খাবারেও আপ্যায়ন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঝুমুর পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শীতের কিছু সবজি কিনে আনল। কিন্তু ফ্রিজে সবজিগুলো তুলে রাখার আগে ফুটন্ত পানিতে অল্প কয়েক মিনিট সিদ্ধ করে নিল। খাবারের জন্য শাক রান্নার সময় ছোট ছোট টুকরা করে কেটে অনেকক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে নিল। হাতের কিছু কাজ শেষ করে সব শেষে শাকগুলো রান্না করল।

ক. চা পাতায় কোন ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়?

খ. খাদ্যের Slowpoison বলতে কী বোঝায়?

গ. ঝুমুর সবজিগুলো ফুটানো পানিতে সিদ্ধ করল কেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ঝুমুরের শাক রান্নার পদ্ধতিটি কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত? বিশ্লেষণ করো।

২. দীপা লক্ষ করল ইদানীং সে বাজার থেকে যে মাছ, মাংস ও সবজি কিনে আনে তা সংরক্ষণ করতে দেরি হলেও নষ্ট হয় না এবং অনেকক্ষণ সতেজও থাকে। এতে দীপা বেশ খুশিই হয়। বিষয়টি নিয়ে সে স্বামীর সাথে আলাপ করলে তিনি বললেন এ ধরনের খাবার আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিষয়টি দীপাকে উদ্বিগ্ন করে।

ক. পিকনিকে কোন ধরনের পরিবেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

খ. খাদ্য পরিবেশন সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন কেন?

গ. দীপার কিনে আনা জিনিসগুলো সতেজ থাকার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দীপার স্বামীর এরূপ মন্তব্য কতটুকু যথার্থ? বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

খাদ্য রান্না

খাদ্য রান্না করা "ভোজ্য দ্রব্য" তৈরির শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য পর্যায়। খাদ্য রান্নার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—খাদ্যকে গ্রহণ উপযোগী, সুস্বাদু, সুগন্ধময় ও আকর্ষণীয় করে তোলা। রান্না খাদ্যকে সহজপাচ্য ও পরিপাক উপযোগী করে। এছাড়াও খাদ্য দ্রব্যের অনেক ক্ষতিকর রোগজীবাণু রান্নার মাধ্যমে ধ্বংস করা যায়।

পাঠ ১ – রান্না করার প্রয়োজনীয়তা

আদিম যুগের মানুষ কাঁচা অবস্থায় খাবার গ্রহণ করত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখার পাশাপাশি রান্নার কৌশলও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। রান্নার প্রচলন বহু যুগ আগেই শুরু হয়েছে। রান্নার উদ্দেশ্যই হচ্ছে খাদ্য বস্তুকে সহজপাচ্য করে দেহের কাজে লাগাবার উপযোগী করা এবং সেই সঙ্গে সুস্বাদু ও জীবাণুমুক্ত করা। রান্না বলতে খাদ্য বেছে, ধুয়ে, কেটে বা অন্য কৌশলে তৈরি করে চুলায় চাপানোকে বোঝায়। ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতে রন্ধন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমেই খাদ্যের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি উন্নত হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে খাদ্য রান্না করা হয়। খাবার রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানার পূর্বে রান্নার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

রান্না করার প্রয়োজনীয়তাগুলো হচ্ছে–

- অধিকাংশ খাবারই মানুষের পক্ষে গ্রহণ উপযোগী থাকে না। রান্না করা খাবার নরম হওয়ার কারণে সহজে চিবানো ও গলাধঃকরণ করা যায়। এতে হজম দ্রুত হয়।

- রান্নার ফলে খাদ্যের যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা পরোক্ষভাবে পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। মাংসে সিদ্ধ করা হলে তাপ ও পানির সংস্পর্শে মাংসের সংযোজক কলার কোলাজেন জিলেটিনে পরিণত হয়ে সহজপাচ্য হয়ে উঠে। মূলত রান্নার ফলে খাদ্যবস্তুতে উপস্থিত উপাদানসমূহ দেহের কাজের উপযোগী হয়ে উঠে।

- তেল, মশলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি রান্নায় ব্যবহৃত উপকরণ— খাদ্যবস্তুর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ বৃদ্ধি করে খাদ্যকে আকর্ষণীয় করে। শস্যদানা ও সবজির শ্বেতসার কণা পানি ও উত্তাপে ফেটে যায় এবং ডেক্সট্রিন মলটজে পরিণত হয় – যার স্বাদ মিষ্টি। ভাজা, সেঁকা, ক্যারামেল করা প্রভৃতি রান্না পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

- ভোজ্যদ্রব্যের আকর্ষণ যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তন্মধ্যে বুনট (Texture) উল্লেখযোগ্য। বুনট দ্বারা রান্না করা খাদ্যের অবয়বিক অবস্থা বোঝানো হয়; অর্থাৎ এটি মোলায়েম, শক্ত বা খসখসে কি না। যেমন – কেক, পুডিং, পিঠা ইত্যাদি। রান্নার মাধ্যমে খাদ্যে তাপ প্রয়োগ করা হয় বলে খাদ্যস্থিত রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়। এর ফলে খাদ্য জীবাণুমুক্ত হয় এবং দেহকে খাদ্যের বিষক্রিয়া এবং ক্ষতিকর পদার্থ থেকে রক্ষা করে।

- রান্নার মাধ্যমে পচনশীল খাদ্যদ্রব্যে তাপ প্রয়োগ করা হয়। ৪৫° সে. থেকে ৬০° সে. তাপমাত্রায় বেশিরভাগ খাদ্যের জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে খাদ্যবস্তু রেখে খাওয়া যায় অর্থাৎ রন্ধন পদ্ধতি পরোক্ষভাবে খাদ্য সংরক্ষণেও সহায়তা করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রান্নায় খাদ্যের স্বাভাবিক রং, গন্ধ, সংরক্ষণ করা হলে পুষ্টিমূল্যেরও অপচয় কম হয়।

- রান্নার মাধ্যমে একই ধরনের খাদ্য উপকরণ দিয়ে একাধিক ভোজ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। এর ফলে ভোজ্য দ্রব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়।

- প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে আবিষ্কৃত হয়েছে রন্ধনের নানা ধরনের পদ্ধতি। খাদ্যবস্তুটি কীভাবে খাওয়া হবে তার উপর নির্ভর করে রান্নার কোন পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যে কারণে রান্নার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল আজও মানুষ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ঠিক সেই কারণেই রান্না করে থাকে।

রান্নার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে রান্নার মাধ্যমে যাতে কোনোভাবেই খাদ্যের পুষ্টিমূল্যের অপচয় না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

কাজ– রান্নার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

পাঠ ২ – রন্ধন পদ্ধতি

সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ আমরা বেশিরভাগ খাদ্যই রান্না করে খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। রান্না মূলত একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে কাঁচা খাদ্যদ্রব্যে তাপ প্রয়োগ করে খাদ্যদ্রব্যের ভৌত অবস্থার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো হয়।

প্রচলিত খাবারগুলো কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়। রান্নার উষ্ণতা, পানি, বাষ্প, তেল ও সময়ের ব্যবহারের তারতম্যের কারণেই বিভিন্ন পদ্ধতির রান্না বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। কেবল সিদ্ধ বা কেবল ভাজা খাবার মানুষের তৃপ্তি মেটাতে পারে না—মানুষ চায় বৈচিত্র্য। এ-কারণেই আদিম যুগে মানুষ কেবল পুড়িয়ে খাবার খেলেও বর্তমান সভ্যযুগে রান্নার অনেক কৌশলের উদ্ভব হয়েছে। রান্না করাকে সহজ ও দ্রুত করার জন্য মানুষ নানারকম প্রক্রিয়া বা রন্ধন কৌশল ব্যবহার করতে শিখেছে।

রান্নার প্রচলিত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে–

ক) **অধিক তাপে ফুটানো বা সিদ্ধ** – এই পদ্ধতিতে ১০০° সে. বা ২১২° ফা. উত্তাপে বেশি পানিতে খাবার সিদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে সিদ্ধ করা পানি ফেলে দিলে পুষ্টির অপচয় হয়। ভাত, ডাল, সুপ, মাংস ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে রান্না করা হয়।

খ) **মৃদু তাপে সিদ্ধ** – এই পদ্ধতিতে অল্প পানিতে অল্প তাপে ধীরে ধীরে বেশিক্ষণ ধরে খাবার ঢেকে রান্না করা হয়। ফলে খাবার সুসিদ্ধ হয়। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, শাকসবজি, কাস্টার্ড, ফিরনি ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা ৮২° সে. থেকে ১০০° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। খাবারের পুষ্টিমান রক্ষায় এ পদ্ধতিটি অধিকতর কার্যকর।

গ) **ভাপে সিদ্ধ করা** – এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুকে সরাসরি পানিতে না দিয়ে উত্তপ্ত পানির বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে বড় পাত্রে পানি ফুটানোর সময় পাত্রের উপর একটা ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরি বা তারজালি, বাঁশের ঝাঁকা কিংবা কাপড় রেখে তার উপর খাবার ঢেকে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ১০০°সে. থেকে ১১২°সে. পর্যন্ত তাপ ব্যবহার করা হলেও বাতাসের সংস্পর্শে না আসায় খাবারের পুষ্টির কোনো অপচয় হয় না। পুডিং, ভাপা পিঠা, ভাপে ইলিশ, প্রেসার কুকারে মাংস সিদ্ধ ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে রান্না করা হয়।

ঘ) **ভাজা** – ভাজা বলতে প্রায় ৩০০° সে. তাপে তেলে ডুবিয়ে খাবার রান্না করা বোঝায়। এ পদ্ধতিতে কম তেলে বা বেশি তেলে খাবার ভেজে রান্না করা হয়। ডুবো তেলে ভাজলে খাবার বাতাসের সংস্পর্শে কম আসে এবং দ্রুত ভাজা হয়। কোনো কোনো খাবার দীর্ঘসময় অল্প তাপে ডুবো তেলে ভেজে মচমচে করা হয়। যেমন–চিপস, সিঙ্গারা, পিয়াজি, নিমকি ইত্যাদি। এতে খাবারের কালরি মান বেড়ে যায়। সবজি ভাজি, মাছ ভাজি, ডিমের ওমলেট ইত্যাদি আমরা অল্প তেলে ভাজি। এক্ষেত্রে খাবার ঢেকে ধীরে ধীরে ভাজা হয়। এতে করে তেল বেশি পোড়ে না। খাবারের পুষ্টি কিছু রক্ষা হয়। ঢাকনা ছাড়া অল্প তেলে খাবার ভাজি করলে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন তেলে দ্রবীভূত হয়ে বাষ্পাকারে উড়ে যায়। এতে পুষ্টিমূল্যের অপচয় হয়।

ঙ) **পোড়ানো বা ঝলসানো** – এই পদ্ধতিতে আলু, বেগুন, মিষ্টি আলু, ভুট্টা ইত্যাদি খাবার সরাসরি আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। শিক কাবাব, বোটি কাবাব, তন্দুরী, মুরগির রোস্ট ইত্যাদি খাবারও এই পদ্ধতিতে করা হয়। এভাবে খাবার রান্না করলে খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বাতাসের সংস্পর্শে ও উত্তাপে অনেকটা নষ্ট হয়।

চ) **সেঁকা বা টালা** – খাবার সরাসরি গরম পাত্রে দিয়ে জলমুক্ত করা বা শুকিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিই হলো সেঁকা বা টালা। এই পদ্ধতিতে তেল বা পানি কোনো তরল পদার্থই ব্যবহার করা হয় না। খাদ্যস্থিত পানি বাষ্পীভূত হয়ে যেটুকু উষ্ণতা ও সময় দরকার হয় তা দিয়েই রান্না সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে গরম বালিতে খৈ, মুড়ি, বাদাম টালা হয়। চিংড়ি, ছোট মাছ শুকনা কড়াইতে টেলে ভর্তা করা হয়। ধনে, জিরা, শুঁটকি গরম খোলায় টালা হয়। গরম তাওয়ায় রুটি সেঁকা হয়।

ছ) **বেকিং** – এই পদ্ধতিতে ওভেন এবং বড় চুলায় (তন্দুর) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর উপরে, নিচে এবং চারদিকে সমানভাবে তাপ প্রয়োগ করা হয়। পাউরুটি, নানরুটি, কেক, বিস্কুট, মাছ, মুরগি ওভেনে সম্পূর্ণরূপে বেক করে রান্না করা যায়। ওভেনে খাদ্য সামগ্রী অনুযায়ী তাপমাত্রা ও সময় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে।

মনে রাখা আবশ্যক যে রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতি কেবল রন্ধনশৈলীর বৈচিত্র্য নয় বরং খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখার বিজ্ঞানসম্মত কৌশলও বটে।

রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতি

কাজ– রান্নার যেকোনো পাঁচটি পদ্ধতি সম্পর্কে লেখো।

পাঠ ৩– রান্নার সময় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতা

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রস্তুতকরণ ও পরিবেশনের পূর্বশর্ত হচ্ছে রন্ধনকারীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে একান্তভাবে তার নিজস্ব পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নখ, চুল, দাঁতের পরিচ্ছন্নতা থেকে পরিধেয় বস্ত্র, ব্যক্তিগত সুস্থতা, কাজ করার সময় পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

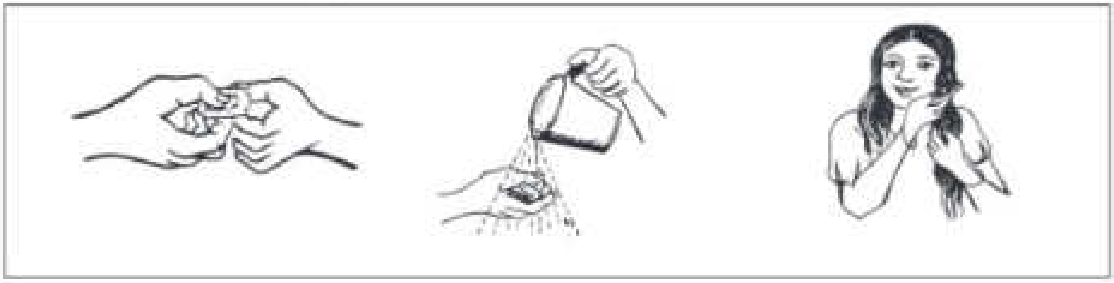

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধরন

রন্ধনকারী রান্নার সময় পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতা রক্ষায় যেসব উপায় অবলম্বন করবেন সেগুলো নিম্নরূপ:

- রান্নার কাজ শুরুর পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- হাতের নখ বড় হলে তাতে ময়লা জমে। রান্নার সময় সেসব ময়লা খাবারের মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণকারীর শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই রন্ধনকারীর নখ যথাসম্ভব ছোট রাখতে হবে।
- রান্নাঘরে নানা ধরনের কাজ করা হয়। কোনো ময়লা জিনিস ধরার পর অথবা হাত দিয়ে মাথা, শরীরের যেকোনো স্থান চুলকানোর পর কখনো সাবান দিয়ে হাত না ধুয়ে খাবার স্পর্শ করা ঠিক নয়।
- হাতে যদি ঘা, চর্মরোগ থাকে তাহলে খুব সহজেই রোগজীবাণু খাদ্যে সংক্রমিত হয়। এ অবস্থায় খাবার রান্না বা পরিবেশন করা উচিত নয়।
- রন্ধনকারীর চুল ভালোভাবে বেঁধে নিতে হয়। তা না হলে খাবারের উপর তা পড়তে পারে। আবার চুল খোলা থাকলে কিংবা ফিতা ঝোলানো থাকলে আগুন লেগে যেতে পারে।
- রন্ধনকারীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে পোশাকই হোক না কেন তা যেন জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়।
- পরিধেয় পোশাক যেন ঢিলেঢালা না হয়। এতে ওড়নায় কিংবা আঁচলে আগুন লেগে যেতে পারে।
- রান্না করার সময় বারবার হাত ধোয়া হয়। এই ধোয়া হাত মোছার জন্য একটা নির্দিষ্ট গামছা বা তোয়ালে থাকা প্রয়োজন। তা না হলে পরিধেয় পোশাকে মুছলে পোশাক নোংরা হবে কিংবা পোশাকের ময়লা খাবারে যাবে।

- যতটুকু সম্ভব রান্নাঘরে কিচেন অ্যাপ্রোন পরার অভ্যাস করা উচিত। এতে পরিধেয় পোশাক ভালো থাকে এবং রান্না ঘরের নিরাপত্তা বজায় থাকে।
- রন্ধনকারীর হাতে গ্লাভস ব্যবহার করাই ভালো।

কাজ– রন্ধনকারীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায়গুলো লেখো।

পাঠ ৪– রান্না করার সময় সতর্কতা

রান্নাঘরে গৃহিণী বা রন্ধনকারীকে আগুন, কাটা বাছায় ধারালো যন্ত্রপাতি ও রান্নার বিভিন্ন ধাতব সাজসরঞ্জাম নিয়ে কাজ করতে হয়। আমাদের দেশের রান্নাঘরগুলো তেমন প্রশস্ত হয় না। রান্নাঘরের অপরিসর আয়তনে, উত্তপ্ত পরিবেশে, রান্নার ব্যস্ততায় অসতর্ক হওয়ামাত্র যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রান্নাঘরে সাধারণত যেসব দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো হচ্ছে— পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, পিছলে যাওয়া ইত্যাদি।

পুড়ে যাওয়া–

সরাসরি জ্বলন্ত চুলা থেকে দাহ্য বস্তুতে আগুন লেগে পুড়ে যেতে পারে। শাড়ির আঁচল, ওড়না, চুলের ফিতায় অসাবধানতাবশত আগুন লেগে তা শরীরে ছড়িয়ে পড়লে শরীর, হাত, মুখ পুড়ে যেতে পারে। রান্নার তেল ছিটকে হরহামেশাই পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এসব দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য যেসব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত–

- রান্না করার সময় চুল, শাড়ির আঁচল, ওড়না আঁটোসাঁটো করে পরিপাটি করে নেওয়া উচিত।
- রান্নার পর চুলা সম্পূর্ণরূপে নিভিয়ে ফেলতে হবে। দিয়াশলাইয়ের কাঠি কখনো জ্বলন্ত অবস্থায় ফেলা উচিত নয়।
- রান্নাঘরের গ্যাসের লাইন, ইলেকট্রিক লাইন ত্রুটিমুক্ত কি না মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন।
- গ্যাসের চুলায় আগুন ধরানোর পূর্বে রান্নাঘরের জানালা খুলে নিতে হয় — তা না হলে গ্যাস লিকেজে আগুন প্রজ্বলিত হয়ে রান্নাঘরে আগুন লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। চুলা থেকে হাঁড়ি নামানো বা নাড়ানোর জন্য গরম প্রতিরোধক কাপড়ের তৈরি মোটা প্যাড বা লোহার বেড়ি ব্যবহার করতে হয়।
- কখনো তেলের কড়াইয়ে উচ্চতাপ প্রয়োগ করতে নাই–এতে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আগুন লাগলে পানি না ঢেলে ঢেকে দিলে আগুন নিভে যায়। এক্ষেত্রে কখনোই পানি দেওয়া উচিত নয়।

কর্তনজনিত দুর্ঘটনা – কারণ ও সাবধানতা

রান্নাঘরে আরও একটি সাধারণ দুর্ঘটনা হলো কেটে যাওয়া। কাটার কাজ করার সময় ছুরি, বটি দিয়ে হাত কেটে যেতে পারে। যথাস্থানে দা-বটি না রাখা হলে অসতর্ক মুহূর্তে কেটে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটে।

অনেক সময় ভাঙা কাচের পাত্র, জং ধরা টিন, ভাঙা প্লাস্টিকের ঢাকনা,অ্যালুমিনিয়াম বা অন্যান্য ভাঙা হাঁড়িপাতিলের কোণা লেগে হাত কেটে যায়। যেখানে লাকড়ির চুলা ব্যবহার করা হয় সেখানে লাকড়ি কিংবা তার কাঁটার খোঁচায় হাত কাটতে পারে।

এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের উপায় হচ্ছে–

- কাটার সরঞ্জামগুলো কাজ শেষ করার পর নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে। অবশ্যই ছোট ছেলেমেয়েদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- কাটার সরঞ্জামগুলোর ধার এমন হওয়া উচিত যাতে কাটার কাজে বেগ পেতে না হয়। এক্ষেত্রে ছোট-বড় ভিন্ন ভিন্ন ধারালো ছুরি, বটির ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- ত্রুটিপূর্ণ, ভাঙা হাঁড়িপাতিল ও কাটার সরঞ্জাম বাদ দিতে হবে।
- কাচের জিনিস ভেঙে গেলে হাত দিয়ে নয় বরং ঝাড়ু দিয়ে ময়লার ট্রেতে তুলে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।

পিছলে পড়া

রান্নাঘরের মেঝেতে পানি, মাড়, তরকারির খোসা প্রভৃতি পড়ে থাকলে কাজের সময় অসাবধানতাবশত পিছলিয়ে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে হাত, পা বা কোমরে চোট পাওয়া, মাথা ফাটা কিংবা শরীরের যেকোনো অংশের হাড় ভাঙার মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এক্ষেত্রে সতর্কতামূলক বিষয়গুলো হচ্ছে–

- রান্না ও কাটা -বাছার কাজ শেষ করে অপ্রয়োজনীয়, উচ্ছিষ্ট অংশ সরিয়ে ফেলে স্থানটি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- ভাতের মাড়, তেল, ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত পানি মেঝেতে পড়ার সাথে সাথেই মুছে ফেলতে হবে। রান্নাঘর সব সময় শুকনা রাখতে হবে।
- রান্নায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি রান্নাঘরে ছড়িয়ে থাকলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই কাজ শেষে এগুলো গুছিয়ে ফেলতে হবে যাতে পায়ে বেঁধে না যায়।
- রান্নাঘর গুঁড়া সাবান, গরম পানি দিয়ে ঘষে নিলে রান্নাঘরের মেঝে পিচ্ছিল হয় না।

মনে রাখা উচিত গৃহিণী বা রন্ধনকারীর সতর্কতাই রান্নাঘরের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের অন্যতম উপায়।

কাজ– রান্নাঘরে দুর্ঘটনা ঘটার কারণগুলো লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অধিক তাপে ফুটিয়ে রান্নার তাপমাত্রা কত?

(ক) ১০০° সে (খ) ২০০° সে

(গ) ৩০০° সে (ঘ) ৪০০° সে

২। নিচের কোন খাবারটি মৃদুতাপে সিদ্ধ করে রান্না করা হয়?

(ক) ডাল (খ) পিয়াজি

(গ) পায়েস (ঘ) সুপ

নিচের উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কান্তা পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রায়ই বিকেল বেলা বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে চপ, মাছের কাটলেট ইত্যাদি তৈরি করে। খাবারগুলো মুখোরোচক বলে সবাই খুব পছন্দ করে।

৩। কান্তা বিকেলের নাশতা তৈরিতে রান্নার কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে?

(ক) মৃদুতাপে সিদ্ধ (খ) ভাজা

(গ) বেকিং (ঘ) সেঁকা

৪। কান্তার তৈরি খাবারগুলোতে আছে–

(i) ভিটামিন এ ও ডি

(ii) ভিটামিন ই ও কে

(iii) ভিটামিন সি ও বি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পুষ্টিবিদ ড. আনোয়ারা একদিন সকালে তার মেয়ে শুভেচ্ছাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে নাশতা করতে গেলেন। শুভেচ্ছা লক্ষ করল দোকানী রুটি তাওয়ায় না ভেজে বিশেষ ধরনের মাটির চুলার ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং একটু পর ফোলানো রুটি বের করে আনছে। শুভেচ্ছাকে তার মা বললেন এটা রান্নার একটা পদ্ধতি। তিনি আরও বললেন খাদ্যকে দেহের গ্রহণ উপযোগী করার জন্যই রান্নার প্রয়োজন।

(ক) মৃদুতাপে রান্নার তাপমাত্রা কত?

(খ) রান্নার সময় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?

(গ) রেস্টুরেন্টে যে পদ্ধতিতে রুটি তৈরি করা হলো তা ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) খাদ্য রান্না সম্পর্কে ড. আনোয়ারার মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

২। রান্নাঘরে চুলায় সমুচা ভাজার সময় তাড়াহুড়া করে তেলের কড়াই নামাতে গিয়ে গরম তেল পড়ে রিমার হাত পুড়ে যায়। মায়ের চিৎকার শুনে রিমার মেয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে গেলে মেঝেতে রাখা বটি দিয়ে তার পা কেটে যায়। রিমার স্বামী তাদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

(ক) রান্নার কাজ শুরু করার পূর্বে কী করতে হবে?

(খ) ক্যালরিবহুল খাদ্য রান্নার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো।

(গ) কোন ধরনের সতর্কতার অভাবে রিমা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) রান্নার কাজে রিমার অসতর্কতা ভবিষ্যতে আরও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে–বিশ্লেষণ করো।

ঘ বিভাগ

পোশাক-পরিচ্ছদ ও বস্ত্র

বস্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে আজকাল বাজারে নানা ধরনের তন্তুর সুতা ও কাপড় পাওয়া যায়। তন্তু থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুতা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত এই সুতা দিয়ে আবার নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। একেক ধরনের বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য একেক রকমের হওয়ায়, এদের ব্যবহার ও যত্নও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই প্রতিটি পরিবারের উচিত তার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক তন্তুর কাপড় নির্বাচন করা। এছাড়া পোশাক একটি ব্যয়বহুল সামগ্রী হওয়ায় এর স্টিচিং, ফিটিং, ফিনিশিং, মূল্য ইত্যাদির আলোকে পোশাক ক্রয় করতে হবে। সভ্য সমাজে পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেলাই করার দক্ষতা থাকলে ঘরে পোশাক তৈরি করাই ভালো। অল্প সময়ে সুন্দর ও পরিপাটিভাবে পোশাক সেলাই করতে হলে কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়।

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- সুতা তৈরির ধাপসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকার বুননের বর্ণনা দিতে পারব;
- বয়স, উপলক্ষ, আবহাওয়া, আয় ইত্যাদির ভিত্তিতে পোশাক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পোশাক ক্রয়ের সময় স্টিচিং, ফিটিং, ফিনিশিং, মূল্য ইত্যাদির আলোকে বস্ত্রের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পোশাক তৈরির জন্য বস্ত্র প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- পোশাকভেদে দেহের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি ও বস্ত্র কাটার নীতি বর্ণনা করতে পারব;
- ড্রাফটিং অনুসারে অ্যাপ্রোন তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

একাদশ অধ্যায়

সুতা তৈরি ও বুনন

পাঠ ১ – সুতা তৈরির সাধারণ পদ্ধতি

আমরা যে পোশাক পরিধান করি তা মূলত প্রস্তুত করা হয় বস্ত্র থেকে। এই বস্ত্র বুনন, নিটিং, ফেল্টিং, বন্ডিং, ব্রেইডিং ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হয়। সুতা হচ্ছে বুনন বা নিটিং প্রক্রিয়ার মূল উপকরণ। তোমরা কি জানো কীভাবে এই সুতা উৎপাদন করা হয়? এই পাঠে আমরা সুতা তৈরির সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করব।

সুতা তৈরির সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে সুতা তৈরির মূল উপাদান কী? সুতার মূল উপাদান হচ্ছে তন্তু। এই সুতা উৎপাদনে যে তন্তু ব্যবহার করা হয় তা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম তন্তু হতে পারে আবার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর মিশ্রণেও সুতা তৈরি করা যেতে পারে। কমপক্ষে আধা ইঞ্চি বা তার চেয়ে বড় অসংখ্য আঁশের সমন্বয়ে সুতা উৎপাদনের বিষয়টি সত্যই বিস্ময়কর। এরূপ তন্তু সমানভাবে লম্বা করে একত্রে পাক বা মোচড় দিলে সুতা উৎপাদিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে বস্ত্র উৎপাদনের জন্য একগুচ্ছ তন্তুকে পাক বা মোচড় দিয়ে একত্রে সন্নিবেশ করে যা তৈরি করা হয় তাই সুতা।

দেখা গেছে যে সুতা উৎপাদনের সময় যদি তন্তুতে বেশি পাক বা মোচড় দেওয়া হয় তাহলে সেই সুতা বেশি শক্ত হবে, কম উজ্জ্বল হবে, দৈর্ঘ্যে কমে যাবে এবং এক পর্যায়ে ছিঁড়ে যাবে।

তোমরা খেয়াল করবে যে কিছু কিছু কাপড় আছে মোটা ও খসখসে প্রকৃতির। দেখা গেছে যে, এ ধরনের কাপড় তৈরিতে যে সুতা ব্যবহার করা হয় তা ছোট আঁশ বা তন্তু থেকে উৎপাদিত। অন্যদিকে লম্বা তন্তু থেকে উৎপাদিত সুতা মসৃণ ও উজ্জ্বল হওয়ায় এরূপ সুতার তৈরি বস্ত্রও মসৃণ ও উজ্জ্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তন্তু থেকে সুতা তৈরির কোনো নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন তন্তুর জন্য সুতা তৈরির পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তুলা, ফ্লাক্স, পশম ইত্যাদি তন্তুর ক্ষেত্রে সুতা তৈরির প্রথম পর্যায় হচ্ছে কার্ডিং। কার্ডিং করার সময় তন্তু থেকে ধুলা, বালি, আলগা ময়লা এবং অতিরিক্ত খাটো তন্তুগুলো দূরীভূত হয়।

কার্ডিং প্রক্রিয়ায় তন্তু থেকে আলগা ময়লা অপসারণ

সুতা তৈরির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে কম্বিং। মোটা সুতা বা কাপড়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু খুব মিহি ও মসৃণ সুতা বা কাপড়ের ক্ষেত্রে তন্তু থেকে অতিরিক্ত খাটো তন্তুগুলো বাদ দেওয়ার জন্য কার্ডিং এর পর কম্বিং করতে হয়। ফলে অবশিষ্ট উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের তন্তুগুলো একটি পাতলা আস্তরণে রূপান্তরিত হয়। এই পাতলা আস্তরণকে স্লাইভার বলে।

ফ্ল্যাক্স বা লিনেন সুতার ক্ষেত্রে কম্বিং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় না। এর পরিবর্তে কম্বিং-এর অনুরূপ যে প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে হেকলিং। খুব মিহি সুতা পেতে হলে লিনেনের তন্তুগুলোকে লম্বা হতে হয় এবং স্লাইভারে তন্তুর অবস্থান সমান্তরাল হতে হয়। তাই এমন সুতার জন্য লিনেনে অনেক বেশি হেকলিং এর প্রয়োজন হয়।

রেশমের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি লম্বা তন্তুকে একত্র করে পেঁচিয়ে রাখা হয়। এই পেঁচানোকে রিলিং বলে। এভাবে কয়েকটি তন্তুকে একত্রীকরণ ও মোচড়ানোকে বলা হয় থ্রোয়িং।

তন্তু থেকে সুতা তৈরির সবশেষ পর্যায় হচ্ছে স্পিনিং। এ ধাপের পূর্বে রোভিং প্রক্রিয়ায় তন্তুর পাতলা আস্তর বা স্লাইভারকে টেনে আরও সরু করা হয় এবং পরবর্তী সময় পাক বা মোচড় দিয়ে সুতায় পরিণত করা হয়। স্লাইভার মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে সুতার রূপ ধারণ করে। রেয়ন, নাইলন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুতেও পাক বা মোচড় দেওয়া হয়। দেখা গেছে যে ছোট তন্তুতে বড় তন্তুর তুলনায় বেশি পাক বা মোচড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সাধারণত মোচড়ের পরিমাণ বেশি হলে সুতাটি বেশি শক্ত হয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত মোচড়ের ফলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। মূল তন্তুর দৈর্ঘ্য ও গুণাগুণভেদে সুতা কাটার সময় মোচড়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

তন্তু থেকে সুতা তৈরির সবশেষ পর্যায়—স্পিনিং

কাজ–১ তন্তু থেকে সুতা উৎপাদনের ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করো।

কাজ–২ সুতা উৎপাদনের সময় বেশি পাক দিলে তার পরিণতি কী হতে পারে অন্য বন্ধুদের কাছে জানতে চাও।

১৫ক

পাঠ ২ – বুনন

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারব যে আমাদের মায়েরা যে শাড়ি, ব্লাউজ পরিধান করে সেই কাপড়ের সাথে আমাদের সালোয়ার, কামিজ কিংবা শার্ট, প্যান্ট-এর কাপড়ের প্রকৃতি এক নয়। এর কারণ কী বলতে পারবে? বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে বস্ত্র উৎপাদন পদ্ধতি। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে বস্ত্র বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদন করা যায়। এই বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতিটি হচ্ছে বুনন।

যে যন্ত্রের সাহায্যে বুনন প্রক্রিয়ায় বস্ত্র উৎপাদন করা হয় তাকে বলে তাঁত। এই তাঁত হস্ত চালিত বা যন্ত্র চালিত হতে পারে। তাঁতের মধ্যে এক সেট সুতা লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে, যাকে টানা বা ওয়ার্প বলে। এই টানা সুতার ভিতর দিয়ে আরও এক সেট সুতা আড়াআড়িভাবে চালনা করে বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। মাকু নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে আড়াআড়িভাবে চালিত এই সুতাকে পড়েন বা ওয়েফ্ট বলে। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি যে তাঁতের সাহায্যে টানা ও পড়েন সুতার পারস্পরিক সমকৌণিক বন্ধনকেই বুনন বলে।

হস্তচালিত তাঁত

দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বয়ন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই মৌলিক বুননকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা–সাদাসিধা বুনন, টুইল বুনন, সাটিন ও স্যাটিন বুনন।

ক. সাদাসিধা বুনন– আমরা বাজার থেকে যেসব লংক্লথ, ভয়েল, পপলিন কাপড় কিনে থাকি সেগুলো মূলত সাদাসিধা বুনন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়। এই বুননের মাধ্যমে গামছা, লুঙ্গি, তাঁতের শাড়ি ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। বস্ত্র বয়ন পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজ বুনন হচ্ছে এটি। এই বুননে একটি পড়েন সুতা একটি টানা সুতার উপর নিচ দিয়ে অতিক্রম করে। বুননে টানা ও পড়েন সুতাগুলো অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করে, ফলে কাপড় খুব মসৃণ ও টেকসই হয় এবং কাপড়ের উপরিভাগ রং করা ও ছাপার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হয়। এ ধরনের কাপড় ময়লা হলে চোখে পড়ে এবং সহজেই পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

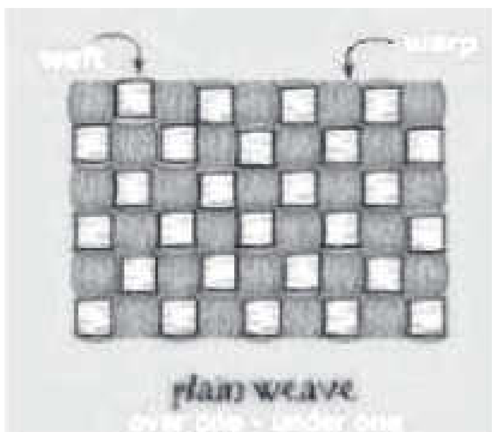

সাদাসিধা বুনন

কাজ– শ্রেণিকক্ষে কাগজের টুকরা দিয়ে শিক্ষকের সহযোগিতায় সাদাসিধা বুনন তৈরি করো ও চার্ট আকারে ক্লাসে তা উপস্থাপন করো।

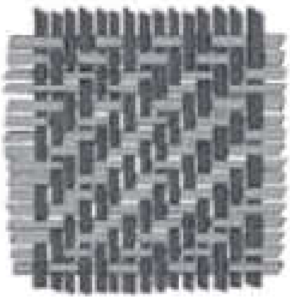
টুইল বুনন

খ. টুইল বুনন– আমরা জিন্স, ড্রিল, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি যে বস্ত্রের পোশাক পরিধান করি তাই টুইল বুননের বস্ত্র। এই বুননে পড়েন সুতা টানা সুতার মধ্য দিয়ে এমনভাবে চলাচল করে যে কাপড়ের উপরিভাগে কোনাকুনি একটি ভাব ফুটে উঠে, তাই একে তেরছা বুননও বলে। এই বুননের কাপড় বেশ মজবুত হয়। ময়লা পড়লে সহজে বোঝা যায় না। তবে যখন বোঝা যায় তখন ময়লা পরিষ্কার করা সাদাসিধা বুননের মতো সহজসাধ্য হয় না।

কাজ– শ্রেণিকক্ষে কাগজের টুকরা দিয়ে শিক্ষকের সহযোগিতায় টুইল বুনন তৈরি করো।

গ. সাটিন ও স্যাটিন বুনন– তেরছা বুননের মতো সাটিন ও স্যাটিন বুননে শিরেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে না। সাটিন বুননের সময় পড়েন সুতাটি একটি টানা সুতার উপর এবং চারটি বা তার অধিক টানা সুতার নিচ দিয়ে চলাচল করে। অন্যদিকে স্যাটিন বুননে পড়েন সুতাটি একটি টানা সুতার নিচ এবং চারটি বা তার অধিক টানা সুতার উপর দিয়ে চলাচল করে। এই দুই ধরনের বুননেই টুইলের মতো অবিচ্ছিন্ন কর্ণ না থাকায় কাপড়ের উপরিভাগ মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়। এই বুননের কাপড় দিয়ে সাধারণত সালোয়ার, কামিজ, পাঞ্জাবি, পায়জামা, ফ্রক, পর্দার কাপড়, বিছানার কভার, সজ্জামূলক পোশাক ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়া কোট, স্যুট ও শেরওয়ানির কাপড়ের লাইনিং-এর জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বুননে কাপড়ের উপরিভাগে বেশিরভাগ সুতা ভাসমান অবস্থায় থাকে, তাই সচরাচর ব্যবহারের জন্য এ ধরনের কাপড় উপযোগী নয়।

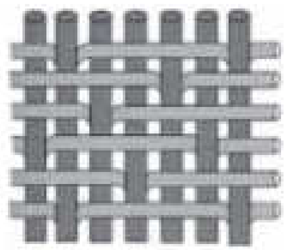
সাটিন বুনন

কাজ–১ শ্রেণিকক্ষে কাগজের টুকরা দিয়ে শিক্ষকের সহযোগিতায় সাটিন ও স্যাটিন বুনন তৈরি করো ও চার্ট আকারে ক্লাসে তা উপস্থাপন করো।

কাজ–২ ছক আকারে পূরণ করে দেখাও কোন ধরনের বুননে কী ধরনের বস্ত্র উৎপাদিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তন্তু থেকে সুতা তৈরির সর্বশেষ পর্যায় কোনটি?

(ক) নিটিং (খ) বন্ডিং
(গ) স্পিনিং (ঘ) গ্রোয়িং

২। নিচের কোন তন্তু থেকে সুতা তৈরির সময় বেশি পাক দিতে হয়?

(ক) রেশম (খ) লিনেন
(গ) তুলা (ঘ) নাইলন

নিচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আদনান সাহেব একটি স্পিনিং মিলে চাকরি করেন। সেখানে সে তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর ইত্যাদির জন্য সুতা তৈরি করার সময় প্রথমেই তন্তুকে কার্ডিং করে নেন।

৩। আদনান সাহেব কোন তন্তু দিয়ে সুতা তৈরি করেন?

(ক) রেশম (খ) নাইলন
(গ) পশম (ঘ) তুলা

৪। এই তন্তু থেকে পরিধেয় বস্ত্রের জন্য সুতা তৈরি করতে কার্ডিং-এর পর আদনান সাহেব কী করবেন?

(ক) কম্বিং (খ) হেকলিং
(গ) রিলিং (ঘ) স্পিনিং

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

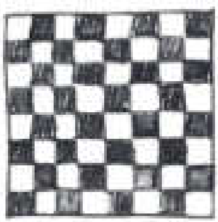

১নং

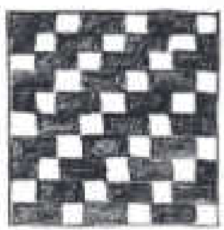

২নং

(ক) বুনন কী?

(খ) সুতা বলতে কী বোঝায়?

(গ) ১নং চিত্রের বয়ন পদ্ধতিতে তৈরি কাপড় ময়লা হলে পরিষ্কার করা সহজ। ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) তুমি কি মনে কর ১ ও ২ নং উভয় চিত্রের বয়ন পদ্ধতির কাপড় ছাপা নকশার জন্য উপযোগী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

পোশাক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

পাঠ ১– পোশাক নির্বাচন

তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন মা-বাবা তোমাদের পোশাক নির্বাচন করতেন। এখন তুমি বড় হয়েছ। তন্তু ও বিভিন্ন বস্ত্র সম্পর্কে তোমার কিছু ধারণা হয়েছে। কাজেই এখন তোমার বা পরিবারের সদস্যদের পোশাক নির্বাচনে তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। আমরা জানি সভ্য সমাজে সব পরিবারের জন্যই পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে বিভিন্ন পরিবারের বস্ত্রের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেননা সব পরিবারের প্রয়োজন ও সামর্থ্য একই রকম হয় না। তবে সব পরিবারেরই পোশাকের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা থাকে। আবার কতগুলো বিষয় আছে যা পরিবারের এই চাহিদাগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে। নিচে পোশাক নির্বাচনে এ ধরনের কিছু বিবেচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো।

আয় অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের পোশাক নির্বাচন

পরিবারের সদস্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনে প্রথমেই আসে আয়ের প্রসঙ্গ। পরিবারের আয় আবার কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—পরিবারের কতজন সদস্য উপার্জন করছে? তাদের পেশা কী? পরিবারের অন্যান্য বিষয়–সম্পত্তি হতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি। দেখা গেছে পরিবারের মোট আর্থিক আয় বেশি হলে পোশাকের খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। অন্যদিকে আয় কম হলে স্বল্প টাকায় বুদ্ধিমত্তার সাথে সময় উপযোগী পোশাক নির্বাচন করা হলে অনেক সময় দামি পোশাকের চেয়েও বেশি প্রশংসা পাওয়া যায়।

বয়স অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের পোশাক নির্বাচন

একটি পরিবারে বিভিন্ন বয়সের সদস্য থাকে। পরিবারের সদস্যদের বয়সকে পোশাক নির্বাচনকালে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা বিভিন্ন বয়সের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত নবজাতকদের শরীর থাকে খুবই স্পর্শকাতর এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও থাকে কম। তাই এদের জন্য হালকা রং, নরম জমিন ও সাধারণ ডিজাইনের পোশাক নির্বাচন করতে হবে, যাতে করে ময়লা লাগলে সহজেই পরিষ্কার করা যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে হলে তাদের জন্য বোতাম, হুক, সেফটিপিন ইত্যাদি বর্জিত নিরাপত্তামূলক পোশাক (safety measure garments) নির্বাচন করতে হবে।

নবজাতকের পোশাক

স্কুলে যাওয়ার পূর্বে বা প্রাক-বিদ্যালয় বয়সে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। তাই তাদের জন্য কিছুটা ঢিলেঢালা কিন্তু খুব লম্বা নয়, এমন পোশাক নির্বাচন করতে হবে। এদের পোশাক নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রঙের পোশাকের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন পোশাকে জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখি বা প্রাকৃতিক বস্তুর ছাপ থাকে। এতে করে স্কুলে যাওয়ার আগেই তারা বিভিন্ন রং ও চারপাশের নানা ধরনের বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের শিশুরা যেন নিজেরাই নিজেদের পোশাক খুলতে পারে ও পরতে পারে সেজন্য নিচের ছবির মতো আত্মনির্ভরশীল পোশাক-পরিচ্ছদ (self-help garments) নির্বাচন করতে হবে।

প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে আত্মনির্ভরশীলতা

কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বোধ গড়ে উঠে। অনেক সময় পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের এ ধাপে মা-বাবার সাথে কিশোর-কিশোরীদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এ বয়সের ছেলেমেয়েদের পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, তবে উক্ত পোশাক যেন আমাদের সমাজ বা কৃষ্টি-বহির্ভূত না হয় সেদিকেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অবসর জীবন বা বৃদ্ধ বয়সে পোশাকের চাহিদা কমে যায় বলে পোশাক নির্বাচনের সময় তাদের অবহেলা করলে চলবে না। এ সময়ের জন্য ওজনে হালকা, আরামদায়ক ও সরল নকশার পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

মৌসুম অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন

পোশাকের উৎপত্তির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাইরের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে শরীরকে রক্ষা করা। আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ হলেও পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ঋতুকে প্রাধান্য দেই। শীতকালে পশমি কাপড়ের বেশি প্রয়োজন হয়। কেননা পশম তন্তুর মধ্যে যে বাতাস ঢুকে থাকে তা দেহের উপর চাপ সৃষ্টি করে; এর ফলে দেহের তাপমাত্রা বের হতে পারে না; ফলে আরাম অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে গরমে ঘাম বেশি হয় তাই এ সময় সুতি, লিনেনের মতো তাপ সুপরিবাহী বস্ত্র বেশি নির্বাচন করা উচিত। এছাড়া বর্ষা ঋতুতে কাপড় ধোয়া ও শুকানোর সুবিধার জন্য নাইলন, টেট্রন, জর্জেট, পলিয়েস্টার জাতীয় কাপড় বেশি উপযোগী। দেখা গেছে সুতি বস্ত্রের দাম কম হলেও ঘামে নষ্ট হয়ে যাবার কারণে এক বছরের পোশাক অন্য বছর অনেক সময় পরা যায় না। অন্যদিকে পশমি বস্ত্র ও কৃত্রিম তন্তুর বস্ত্র একটু বেশি দাম দিয়ে কিনলেও যত্নসহকারে রাখলে কয়েক বছর একই পোশাক ব্যবহার করা যায়। পোশাক নির্বাচনে এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

গ্রীষ্মকালের পোশাক	শীতকালের পোশাক	বর্ষা ঋতুর পোশাক

উপলক্ষ্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন

সামাজিক বিভিন্ন আচারঅনুষ্ঠানে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ধরনের পোশাকের প্রয়োজন হয়। যেমন–গায়ে হলুদ, বিয়ে, ঈদ, মিলাদ, পূজা, জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি। আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণত সুন্দর, তুলনামূলকভাবে দামি ও বৈচিত্র্যময় পোশাক দরকার হয়। এছাড়া মসজিদ, গির্জা, মন্দির প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার সময় আমরা সাদাসিধা ধরনের বিশেষ পোশাক নির্বাচন করে থাকি। কাজেই সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পোশাক নির্বাচন করতে হয়।

বিয়ের পোশাক

সদস্যদের পেশা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন

আমরা সমাজে নানা পেশার লোক দেখতে পাই। যেমন—উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাধারণ অফিসার, পিয়ন, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, শ্রমিক, ডাক্তার, নার্স, বৈমানিক, সৈনিক, অগ্নিনির্বাপক কর্মী ইত্যাদি। কে কোন ধরনের পোশাক নির্বাচন করবে তা নির্ভর করে তার পেশার উপর। যেসব পেশায় নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম রয়েছে তাদের পোশাক নির্বাচনে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে যাদের পেশায় ইউনিফর্ম নেই তাদের পোশাক নির্বাচনে খেয়াল রাখতে হবে যেন তা আটপৌরে বা অনানুষ্ঠানিক পোশাক না হয়। কেননা পেশা ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরলে মানুষ কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং সম্মান পায়।

পুলিশ বাহিনীর পোশাক

নার্সের পোশাক

কৃষ্টি ও জাতীয়তা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন

প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব কিছু রীতিনীতি থাকে। যেমন—পাশ্চাত্যের মহিলারা প্যান্ট, শার্ট, স্কার্ট, টপস ইত্যাদি পরে। আমাদের দেশের সামাজিক রীতি অনুসারে মহিলারা শাড়ি, সালোয়ার, কামিজ ইত্যাদি পরে। পুরুষেরা নির্বাচন করে লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি, পায়জামা ইত্যাদি। অন্যদিকে চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার চাকমা মহিলারা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। সিলেট জেলার মণিপুরী অঞ্চলের মহিলারা লুঙ্গির মতো করে এক টুকরা কাপড় পরে, স্থানীয় ভাষায় যাকে 'ফনেক' বলে। এছাড়া তারা ব্লাউজ এবং ওড়নাও ব্যবহার করে। কৃষ্টি ও জাতীয়তা পরিবারের সদস্যদের পোশাক নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। সুতরাং নিজেদের পোশাক নির্বাচন করার সময় প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী মানানসই পোশাক নির্বাচন করা উচিত। দেখা গেছে সমাজ ও সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত পোশাক মানুষের মনে সামাজিক নিরাপত্তা ও মানসিক তৃপ্তি আনে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক

বাঙালির পোশাক

পশ্চিমাদের পোশাক

কাজ– পোশাক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করে একটি ছক তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বোধ গড়ে উঠে?

(ক) কৈশোর (খ) প্রাক-কৈশোর

(গ) যৌবন (ঘ) প্রারম্ভিক কৈশোর

২। পরিবারের সদস্যদের পোশাক নির্বাচনে প্রাধান্য বিস্তার করে-

(i) কৃষ্টি

(ii) জাতীয়তা

(iii) নিরাপত্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নাছিমার অফিস বাড়ি থেকে অনেক দূরে হওয়ায় পোশাক নির্বাচনে জর্জেটকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে লিনেন কাপড় বেছে নেন।

৩। নাছিমার প্রাধান্য দেওয়া কাপড়টি–

(i) ধোয়া ও শুকানো সহজ

(ii) ইস্ত্রি ছাড়াও পড়া যায়

(iii) তাপ সুপরিবাহী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। নাছিমার গ্রীষ্মকালে নির্দিষ্ট তন্তুর কাপড় বেছে নেওয়ার কারণ?

(ক) দামে সস্তা

(খ) তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি

(গ) সহজে তাপ চলাচল করে

(ঘ) দীর্ঘদিন ব্যবহারের অনুপযোগী

সৃজনশীল প্রশ্ন

সালমা হক তার দুই মেয়ে নাহি ও নিমুর জন্য জামা কিনতে মার্কেটে যান। নিমু তিন মাস বয়সি হওয়ায় হালকা রঙের সিনথেটিকস কাপড়ের উপর নকশা করা জামা কেনেন। আর চার বছর বয়সি নাহির জন্য ঢিলেঢালা উজ্জ্বল বর্ণের বিভিন্ন প্রাণীর ছাপ সংবলিত সামনে বোতাম দেওয়া জামা কেনেন। সালমা হক বাড়ি এসে নিমুকে জামা পরালে নিমু অস্বস্তিবোধ করে।

(ক) পোশাক নির্বাচনে কোন বিষয়ের প্রাধান্য দিতে হয়?

(খ) গ্রীষ্মকালীন পোশাক বলতে কী বোঝায়?

(গ) নিমুর অস্বস্তিবোধ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) সালমা হকের নির্বাচিত পোশাক নাহির জন্য উপযোগী–তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পোশাক ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়

পাঠ ১ – স্টিচিং, ফিটিং, ফিনিশিং ও মূল্য

পরিবারের পোশাকের চাহিদা মেটানোর জন্য সদস্যদের সংখ্যা, চাহিদার ধরন, উপলক্ষ্য,আবহাওয়া, আরাম ও সৌন্দর্য, যত্নের সুবিধা ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করে পোশাক ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ডিজাইন, সাইজ ও মূল্যের তৈরি পোশাক বাজারে পাওয়া যায়। যখন পোশাকের চাহিদা মেটাতে তৈরি পোশাক ক্রয় করা হয় তখন কয়েকটি বিষয় না দেখে ক্রয় করলে পোশাক পরিধানকারীর আরাম ও সৌন্দর্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেগুলো হলো–

- পোশাকের স্টিচিং অর্থাৎ সেলাই
- ফিটিং অর্থাৎ দেহাকৃতির সাথে মানানসই কি না
- ফিনিশিং অর্থাৎ পোশাকের সামগ্রিক সৌন্দর্য
- মূল্য অর্থাৎ যে দামে ক্রয় করা হচ্ছে

পোশাকের স্টিচিং–

স্টিচিং বলতে ক্রয় করা পোশাকটির সেলাইয়ের মান ও প্রকৃতির ধরন বোঝানো হয়েছে। স্টিচিং-এর উপর পোশাকের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। উন্নত স্টিচিং-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

- সেলাইয়ের সুতা মজবুত হবে।
- সুতার রং পাকা হবে।
- পোশাকের রঙের সাথে সুতার রং মানানসই হবে।
- সেলাই পরিচ্ছন্ন হবে অর্থাৎ জট বাধা কিংবা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হবে না।
- পোশাকের যেসব স্থানে চাপ পড়ে সেসব স্থানে দুইবার সেলাই থাকবে।
- সেলাইয়ের বাইরের অংশে ওভার লকিং সেলাই থাকবে। এর ফলে পোশাকের প্রান্তধার থেকে সুতা উঠতে পারে না।
- ওড়নার ধারে হেম অথবা মেশিনে সেলাই করা থাকবে।
- সেলাইয়ের ধারে কমপক্ষে ১.৩ সে. মি. বা ০.৫ ইঞ্চি কাপড় থাকতে হবে। তা না হলে পরিধানের পর চাপে সেলাই ফেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফিটিং–

তৈরি পোশাক কেনার সময় পরিধানকারীর দেহাকৃতির সাথে মানানসই নকশা, আকার ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এবং পরিধানকারীর বয়স, পেশা, দেহাকৃতির ধরন ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করে পোশাক ক্রয় করা উচিত। পোশাকের ফিটিং এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে উঠাবসা,

হাঁটাচলা ইত্যাদি নৈমিত্তিক কাজে অসুবিধা না হয়। এজন্য পরিধানকারীর দেহের প্রকৃত মাপের সাথে কিছু বাড়তি মাপ যোগ করা হয়। যেমন–বুকের প্রকৃত মাপ ৩২ ইঞ্চি বা ৮১.২৮ সে.মি. হলে, তার সাথে সেলাইয়ের জন্য ১ ইঞ্চি বা ২.৫৪ সে.মি. এবং আরামদায়কের জন্য ২ ইঞ্চি বা ৫.০৮ সে.মি. যোগ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া পোশাক ক্রয়ের সময় দেখতে হবে পোশাকের কোথাও যেন কোনো কুঞ্চন, টান বা ঢিলা না থাকে।

ফিনিশিং–

তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে ফিনিশিং বলতে পোশাকটির সেলাইয়ের মান, নকশার উপযুক্ততা, ফিটিং ইত্যাদির সমন্বিত অবস্থাকে বোঝায়। ফিনিশিং মূল্যায়নের জন্য তৈরি পোশাকে সংযোজিত লেবেল অনেকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। লেবেলের মাধ্যমে মূল্য, সাইজ, যত্নের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানা যায়।

মূল্য–

পরিবারের বস্ত্র বা পোশাক ক্রয়ের জন্য মোট খরচের নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে পারিবারিক বাজেটের নির্ধারিত অঙ্কের টাকার মধ্যেই পোশাক ক্রয়ের চেষ্টা করতে হয়। নির্দিষ্ট বাজেটের উপর ভিত্তি করে পোশাক ক্রয় করা হলে তা পরিবারের অর্থ ব্যবস্থাপনার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না।

বর্তমানে তৈরি পোশাকে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এর ফলে পছন্দসই তৈরি পোশাকটি বেশ চিন্তাভাবনা করে ক্রয় করতে হয়। দোকানে যখন কম ভিড় থাকে তখন হাতে সময় নিয়ে অনেক দোকান ঘুরে মূল্য যাচাই করে দেখতে হয়। প্রয়োজনে অভিজ্ঞজনের সাথে তথ্য যাচাই করে নেওয়া যায়। এতে ঠকার সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের দেশে Fixed Price অর্থাৎ নির্ধারিত মূল্যের দোকান তুলনামূলকভাবে কম। তাই ক্রয়ের সময় দরদাম করতে হয়। পরিচিত দোকান এবং সুনাম আছে এমন সব দোকান থেকে কেনা ভালো। এতে একদিকে যেমন ঠকার ভয় থাকে না, অপর দিকে কাপড় ও পোশাকের মানও ভালো হয়। এছাড়া বড় দোকানে বছরে ২-১ বার মূল্যহ্রাসে তৈরি পোশাক বিক্রয় করা হয়। ঐ সময় ভালোভাবে দেখে কিনতে পারলে মূল্যের সাশ্রয় হয়।

কাজ– পোশাক ক্রয়ের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পোশাকের স্থায়িত্ব কীসের উপর নির্ভর করে?

(ক) রং (খ) সৌন্দর্য

(গ) মূল্য (ঘ) স্টিচিং

২। বস্ত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ কোথায় থাকে?

(ক) সুতায় (খ) রঙে

(গ) লেবেলে (ঘ) জমিনে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুক্তি বেশির ভাগই কেনা পোশাক পরে এবং বারবারই কেনা পোশাকে নানাবিধ সমস্যা ধরা পড়ে। এতে সে খুবই বিরক্ত হয়। বান্ধবীর পরামর্শে এবার সে দর্জির তৈরি পোশাক পরে। পোশাকটি পরে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৩। মুক্তির ক্রয়কৃত পোশাকে কোনটি বজায় থাকে না?

(ক) মূল্য (খ) আধুনিকতা

(গ) পোশাকের আরাম (ঘ) ডিজাইন

৪। দর্জির তৈরি পোশাক ও ক্রয়কৃত পোশাকের পার্থক্য হলো–

(i) স্টিচিং

(ii) ফিটিং

(iii) ফিনিশিং

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তন্বী ঈদের সময় তাড়াহুড়া করে বেশি দাম দিয়ে তৈরি পোশাক কেনে। খেতে বসে তরকারির ঝোল পড়ে কাপড়টি নষ্ট হয়। ধোয়ার পর সে দেখতে পেল কাপড়টির সেলাই খুলে গেছে। সুতারও রং উঠে গেছে। তার পুরা অর্থটাই বিফলে যায়।

(ক) পোশাকের স্থায়িত্ব কীসের উপর নির্ভর করে?

(খ) স্টিচিং বলতে কী বোঝায়?

(গ) তন্বীর কেনা পোশাকের ত্রুটি ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) বাজারদর যাচাই করে পোশাক ক্রয় করলে তন্বীকে উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না–তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। সায়মা প্রতিবারই পোশাক কিনে সমস্যায় পড়ে। সেদিন ক্রয়কৃত জামাটি কেনার পর দেখে গায়ে ওটা বেশ চাপা হয়। উঠাবসা করতে কষ্ট হয়। এছাড়াও পোশাকটির বাহ্যিক অসমৃণতা ধরা পড়ে। পোশাক বদলাতে গিয়ে দেখতে পায় পোশাকের রং গায়ে লেগেছে। ওর খালা পোশাকের লেবেল দেখে পোশাক ক্রয় করার পরামর্শ দেন।

(ক) তৈরি পোশাক শিল্পে ফিনিশিং কী?

(খ) পরিধানকারীর মাপের সাথে বাড়তি মাপ যোগ করা হয় কেন?

(গ) পোশাক ক্রয়ে সায়মার দৈহিক ফিটিং-এর জন্য লক্ষণীয় বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) খালার পরামর্শটি পোশাক ক্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

পোশাক তৈরি

সভ্য সমাজে সব পরিবারের জন্যই পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেলাই করার দক্ষতা থাকলে এবং পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকলে ঘরে পোশাক তৈরি করাই ভালো। কারণ নিজেরা ঘরে পোশাক তৈরি করলে কম মূল্যে পোশাক তৈরি করা যায়; পোশাকের ফিটিং, সেলাইয়ের মান এবং সমাপ্তিকরণ ভালো হয়। অল্প সময়ে সুন্দর ও পরিপাটিভাবে পোশাক সেলাই করতে হলে কতগুলো ধারাবাহিক ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়।

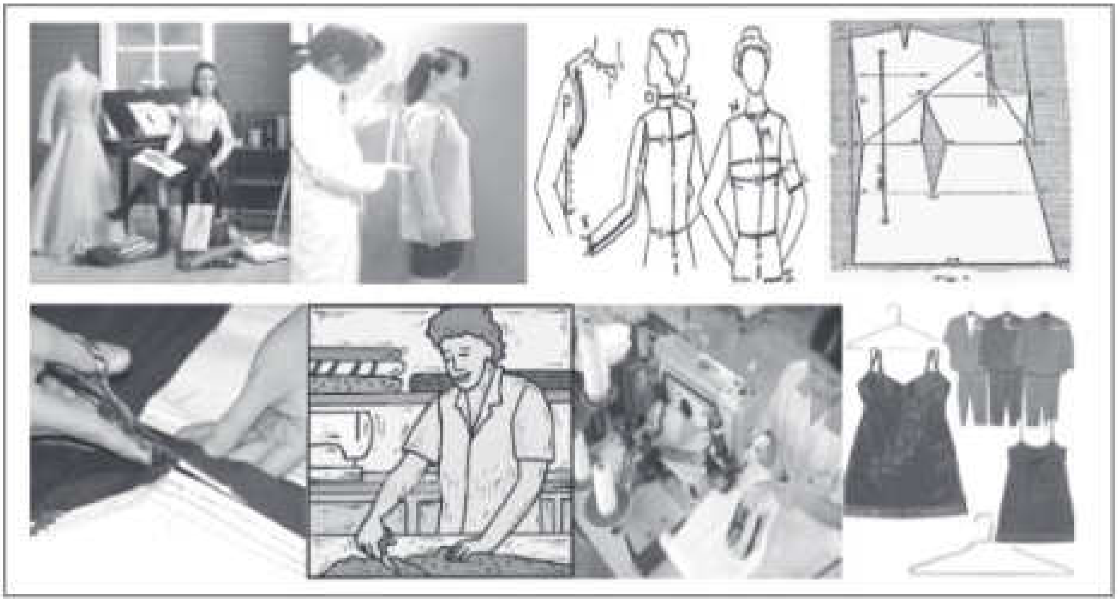

পাঠ ১ – পোশাক তৈরির জন্য বস্ত্র প্রস্তুতকরণ

বিভিন্ন ধরনের তন্তু যেমন — তুলা, ফ্লাক্স, রেশম, পশম, নাইলন, রেয়ন ইত্যাদি থেকে বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। এই বস্ত্র থেকে তৈরি হয় পোশাক। বস্ত্রটি হাতে বা মেশিনে বোনা হতে পারে কিংবা তাঁতের তৈরিও হতে পারে। পোশাকের জন্য নির্বাচিত কাপড়টি তৈরির পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হওয়ার জন্য কাপড়ের মাঝে কখনো কখনো ফাঁক থেকে যায়। পোশাক তৈরির আগে কাপড় ধুয়ে নিলে এই ফাঁকগুলো ঠিক হয়ে যায়। যদি কাপড় না ধুয়ে বুননের ফাঁক সমৃদ্ধ কাপড় দিয়ে পোশাক প্রস্তুত করা হয় তবে তা দিয়ে তৈরি পোশাক ধোয়ার পর সংকুচিত হয়ে পরিধানের অনুপযোগী হয়ে যায়। তাই ছাঁটার আগে কাপড় প্রস্তুত করে নিলে পোশাক ছোট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পোশাক ছাঁটার আগে সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে কাপড় প্রস্তুত করা

হয়। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

১। **সংকুচিত করা–** যেসব কাপড় পানিতে ভেজানো যায় সেগুলো প্রথমে কয়েক ভাঁজ করে একটি পরিষ্কার গামলায় রেখে তার মধ্যে এমনভাবে পানি দিতে হবে যেন কাপড় ভালোভাবে ডুবে থাকে। এভাবে ৮/৯ ঘন্টা রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করে দিতে হবে। তারপর পানি থেকে কাপড় তুলে দু হাতের তালুর মধ্যে রেখে চাপ দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কাপড় নিংড়ানো উচিত নয়। এরপর কাপড় ঝেড়ে শুকাতে দিতে হবে। যদি খুব তাড়াতাড়ি কাপড় সংকুচিত করার দরকার হয় তবে দুটি পাত্র নিয়ে একটি পাত্রে গরম পানি এবং অপরটিতে ঠান্ডা পানি নিতে হবে। এবার কাপড় কয়েক ভাজে ভাঁজ করে একবার গরম পানিতে ও একবার ঠান্ডা পানিতে ৫-১০ মিনিট করে রাখতে হবে। এভাবে ৫/৬ বার করার পর কাপড় শুকাতে দিতে হবে।

কাপড় সংকুচিত করা

২। **কাপড়ের ধার সোজা করা–** ছাঁটার সময় কাপড়ের ধার সোজা না থাকলে পোশাক ছাঁটতে অসুবিধা হয়। এজন্য কাপড় ছাঁটার আগে ধারগুলো সোজা করে নিতে হয়। কাপড় পানিতে ভিজিয়ে সংকুচিত করার পর অল্প ভেজা থাকতেই একটি টেবিলের উপর সমানভাবে বিছিয়ে দুই দিক টেনে সোজা করতে হয়। এছাড়া প্রয়োজনে কাপড়ের আড়দিকের একটি সুতা টেনে তুলে ঐ বরাবর কাপড় ছেঁটে ধার সোজা করা যায়।

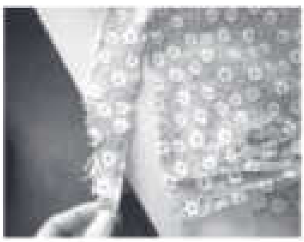

কাপড়ের ধার সোজা করা

৩। **ইস্ত্রি করা –** কাপড় সংকুচিত করার পর অনেক সময়ই কাপড়ে ভাঁজ পড়ে। কাপড়ের এই কুঁচকানো ভাব দূর করার জন্য ইস্ত্রি করা প্রয়োজন। সব সময় কাপড়ের উল্টাদিকে লম্বালম্বিভাবে ইস্ত্রি করতে হয় এবং বস্ত্রের তন্তুরপ্রকৃতি অনুসারে ইস্ত্রির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে নিতে হয়।

ইস্ত্রি করা

ছাপা বা রঙিন কাপড়ের রং পাকা কি না তা কাপড় কাটার পূর্বেই পরীক্ষা করা উচিত। এক্ষেত্রে কাপড়ের কিনারা থেকে সামান্য কাপড় সাবান ও হালকা গরম পানিসহযোগে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে আবার পুরা কাপড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি কাপড়ের ছাপা উঠে যায় বা রং বিবর্ণ হয় তবে ১ গজ কাপড়ে একমুঠো লবণ দিয়ে পানিতে প্রায় ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে সংকুচিতকরণের পাশাপাশি রংও পাকা হবে।

কাজ– পোশাক তৈরির জন্য বস্ত্র প্রস্তুতকরণের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করো।

পাঠ ২– দেহের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি

মানানসই ফিটিং সমৃদ্ধ পোশাক তৈরির অন্যতম শর্ত হলো নকশা অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিধানকারীর দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নেওয়া। পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে কাগজে মূল নকশা অঙ্কন করা হয়। মাপ অনুসারে মূল নকশাকে পরে চূড়ান্ত নকশা বা প্যাটার্নে রূপ দেওয়া হয়। সর্বশেষে চূড়ান্ত নকশা অনুযায়ী কাপড় ছাঁটা ও সেলাই করে পোশাক তৈরি করা হয়।

পোশাকভেদে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নেওয়া হয়। তাই কামিজ তৈরির সময় দেহের যেসব অংশের মাপ নেওয়া হয়, প্যান্ট তৈরির সময় সেসব অংশের মাপ নেওয়া হয় না।

যেকোনো পোশাকের পরিকল্পনা করা হোক না কেন মাপ নেওয়ার সময় মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। যেমন–

১) একটি দৃঢ় অথচ নমনীয় ও সঠিক মাপার ফিতা ব্যবহার করতে হবে।

২) মাপার সময় ফিতা সোজা করে ধরা উচিত।

৩) কখনো নিজের মাপ নিজে নেওয়া ঠিক নয়। এতে মাপ ঠিক হয় না।

৪) মাপ নেওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৫) কোমরের মাপ নেওয়ার সময় কোমরের স্বাভাবিক ভাঁজে আলগাভাবে ফিতা রেখে মাপ নিতে হবে।

৬) বুকের মাপ নেওয়ার সময় পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করে মাপ নিতে হবে।

৭) হিপের মাপ নেওয়ার সময় সবচেয়ে স্ফীত অংশের উপর ফিতা রেখে মাপ নিতে হবে।

৮) কোমর, বুক ও হিপের মাপ নেওয়ার সময় ফিতার নিচে চারটি আঙুল বিছিয়ে রাখতে হবে।

৯) হাতার ঘের, গলা, প্যান্টের মৌরী প্রভৃতি মাপ নেওয়ার সময় দু টি আঙুল ফিতার নিচে রাখতে হবে।

১০) ফুল হাতার লম্বার মাপ নিতে হলে কব্জি থেকে ১.৯০ সে.মি. বেশি মাপ নিতে হবে।

১১) যে ব্যক্তির মাপ নেওয়া হবে তাকে একটি ফিটিং ড্রেস পরে নিতে হবে।

১২) প্রতিটি মাপ নেওয়ার সাথে সাথে তা খাতা বা নোট বুকে লিখে রাখতে হবে।

পোশাক তৈরিতে শরীরের যেসব অংশের মাপ নিতে হয়, সেলাই-এর পরিভাষায় সেগুলোর বিশেষ নাম রয়েছে। এখানে শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করে মাপ নেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

১। **ঝুল** – ঝুল বলতে পোশাকের লম্বা মাপকে বোঝায়। যেমন–কামিজের ক্ষেত্রে ২ নং চিত্রে ক-খ পর্যন্ত পোশাকের ঝুলের মাপ। অন্যদিকে প্যান্ট বা সালোয়ারের ক্ষেত্রে ৩ নং চিত্রে গ-ঘ পর্যন্ত মাপ।

২। **পুট** –মেরুদণ্ডের সবচেয়ে উঁচু হাড় থেকে কাঁধের শেষ প্রান্তের উঁচু হাড় পর্যন্ত মাপকে পুট বলে। ২ নং চিত্রে ক-গ পর্যন্ত মাপ।

৩। **গলা** –গলার মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র করে চারদিক বেষ্টন করে গলার মাপ নিতে হয়।

৪। **হাতা** –কাঁধের শেষ প্রান্ত থেকে কব্জি বরাবর বা ইচ্ছামতো লম্বা মাপ।

৫। **মুহরি** –বাহু বা কব্জির ঘেরের মাপকে মুহরি বলে। ২ নং চিত্রে চ-ঙ বাহুর ঘেরের মাপ।

৬। **বুক** –বুকের সবচেয়ে স্ফীত অংশের ঘেরের মাপ। ১ নং চিত্রে ক-খ বরাবর বেষ্টন করে যে মাপ।

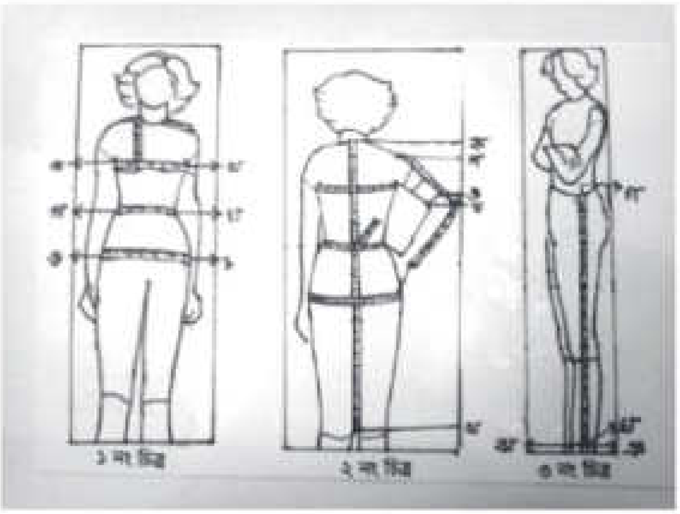

দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ

৭। **কোমর** –কটি রেখার চারদিকের ঘেরের মাপ। ১ নং চিত্রে গ-ঘ বরাবর বেষ্টন করে যে মাপ ।

৮। **হিপ** –কোমর থেকে ১৭.৭-২২.৮ সে.মি. নিচের সবচেয়ে স্ফীত অংশের ঘেরের মাপ। ১ নং চিত্রে ঙ-চ বরাবর বেষ্টন করে যে মাপ।

৯। **মৌরী** –ফুল প্যান্ট,পায়জামা, সালোয়ার প্রভৃতি পোশাকের পায়ের ঘেরের মাপ। ৩ নং চিত্রে ঞ্চ-এর বিন্দু বরাবর বেষ্টন করে পছন্দমতো যে মাপ।

কাজ– পোশাক তৈরিতে দেহের যেসব অংশের মাপ নিতে হয় চিত্রের মাধ্যমে পোস্টার পেপারে প্রদর্শন করো।

পাঠ ৩ – বস্ত্র কাটার নীতি

কাপড় ছাঁটায় সৃজনশীলতা আনতে হলে কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এ কৌশলগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

১। কাপড়টি টেবিলের বাইরে যেন ঝুলে না পড়ে সেজন্য সমান করে টেবিলের উপর বিছিয়ে নিতে হবে।

২। কাপড়ের সোজা দিক ভিতরে রেখে উল্টাদিকে সবগুলো প্যাটার্ন বিছিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রয়োজনীয় কাপড় আছে কি না।

৩। কাপড় ছাঁটার সময় ভাঁজের কৌশল অবলম্বন করা দরকার। কাপড় লম্বালম্বি ছাঁটলে পোশাকের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বাড়ে এবং কাপড়ের অপচয়ও রোধ করা যায়।

৪। কাপড় ছাঁটার সময় কাপড়ের ছাপার দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। ছাপা কাপড়ের ফ্রক কাটতে হলে ড্রাফটগুলো এমনভাবে কাপড়ের উপর বিছাতে হবে যেন পোশাকের উপরের অংশের ছাপার সাথে নিচের অংশের ছাপার একটি সুন্দর মিল থাকে।

ছাপা কাপড়

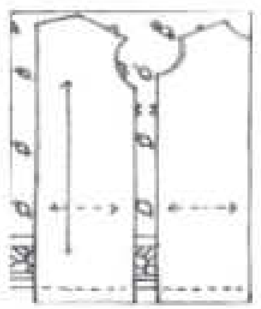

পাড় সহ কাপড়

৫। পাড়সহ যেসব কাপড় পাওয়া যায় সেগুলো ছাঁটার সময় পাড় যেন পোশাকের নিচের দিকে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অনেক সময় পাড়গুলো আলাদাভাবে কেটে লাগালেও পোশাক দেখতে সুন্দর লাগে।

৬। কাপড়ের উপর সব ধরনের প্যাটার্ন বিছিয়ে আলপিন দিয়ে প্যাটার্নগুলো আটকিয়ে কাপড় ছাঁটতে হয়।

৭। কাপড় ছাঁটার সময় মাঝারি আকারের (১৭.৭৮ সেন্টিমিটার- ২০.৩২ সেন্টিমিটার) ধারালো কাঁচি ব্যবহার করতে হবে। কাপড় কখনো হাতে রেখে ছাঁটা উচিত নয়। প্যাটার্ন ও কাপড় এক হাতে চাপ দিয়ে ধরে অন্য হাতে কাঁচি চালাতে হয়।

ড্রাফটের মাধ্যমে কাপড় কেটে কীভাবে একটি পোশাক তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে আমরা এখন জানার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে খুবই সাধারণ একটি পোশাক কিচেন অ্যাপ্রোনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। রান্নাঘরে তেল, মশলার দাগ থেকে পরিধেয় পোশাক রক্ষার জন্য কিচেন অ্যাপ্রোন ব্যবহার করা হয়।

৮৬.৫ সে.মি./৩৪" লম্বা ও ৪৬ সে.মি./১৮" প্রস্থ বিশিষ্ট অ্যাপ্রোন তৈরি করতে হলে ১নং চিত্র অনুযায়ী ৯১.৪৪ সে.মি./৩৬" লম্বা এবং ২২.৮৬ সে.মি./৯" চওড়া বিশিষ্ট ক খ গ ঘ একটি আয়তাকার কাগজ নিতে হবে। এরপর ১নং চিত্রানুসারে ঙ থেকে চ পর্যন্ত বাঁকাভাবে হাতার সেইপ করতে হবে। এখন ৯১.৪৪ সে.মি./৩৬" লম্বা এবং ৪৬ সে.মি./১৮" চওড়া বিশিষ্ট একটি কাপড়কে লম্বালম্বিভাবে দুই ভাঁজ করে কাগজের ড্রাফট ফেলে ছাঁটার পর ভাঁজ খুললে ২নং চিত্রের মতো অ্যাপ্রোনের আকৃতি হবে।

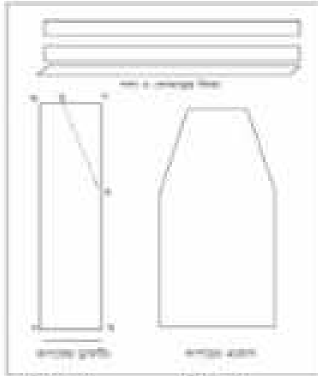

চিত্র: ১ চিত্র: ২

কিচেন অ্যাপ্রোন

এবার অ্যাপ্রোনের প্রান্ত ধারগুলোতে হেম সেলাই দিলে উপরে ও নিচে প্রায় ৫ সে.মি./২" এর মতো কমে অ্যাপ্রোনটির মাপ ৮৬.৫ সে.মি./৩৪" তে দাঁড়াবে। সবশেষে অ্যাপ্রোনের কোমরের দুই দিকে দুইটি লম্বা ফিতা ও গলার উপরে বখেয়া সেলাই-এর সাহায্যে চিত্রের ন্যায় ফিতা সংযোজন করলেই অ্যাপ্রোন তৈরি হয়ে যাবে।

কাজ– ড্রাফটিং করার পর কাপড় কাটার নীতি অনুসরণ করে একটা কিচেন অ্যাপ্রোন তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পরিধানকারীর মাপ অনুসারে কাগজে কী তৈরি করা হয়?

(ক) চূড়ান্ত নকশা
(খ) মূল ড্রাফট
(গ) ড্রেপিং পদ্ধতি
(ঘ) প্যাটার্ন ড্রাফটিং

২। পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়–

(i) পরিবারের আয়ের বিষয়টি
(ii) পোশাক ব্যবহারকারীর বয়স
(iii) কোন ঋতুতে পোশাকটি ব্যবহৃত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মিতু তার জামা তৈরির প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে পরিচিত একজন দর্জিকে দিয়ে জামাটি বানায়। জামাটি কয়েকদিন পরার পর ধুতে গেলে রং উঠে হালকা হয়ে যায়। পরবর্তী সময় সে জামাটি পরতে গিয়ে দেখে তার গায়ে লাগছে না। এটি বেশ ছোট হয়ে গিয়েছে।

৩। মিতুর জামা তৈরির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন ছিল?

ক. সঠিক ভাঁজের কৌশল অনুসরণ করা
খ. তৈরির পূর্বে কাপড় ইস্ত্রি করা
গ. তৈরির পূর্বে কাপড় ধুয়ে নেওয়া

৪। মিতুর জামাটি পরার উপযোগী হতো, যদি জামার কাপড়টি–

(i) প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে তৈরি করা হতো
(ii) সংকুচিত করে নেওয়া হতো
(iii) একজন দক্ষ দর্জিকে দিয়ে তৈরি করানো হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফিরোজা বেগম কিচেন অ্যাপ্রোন তৈরির জন্য ১ গজ লংক্লথ কাপড় কেনেন। ড্রাফট ব্যবহার না করে এক গজ কাপড় লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করে ঝুল ৩৪" এবং বুক ৩২" মাপে কিচেন এপ্রোন তৈরি করেন। অ্যাপ্রোন তৈরির পর দেখা গেল ফিরোজা বেগমের দেহে অ্যাপ্রোনটি সঠিকভাবে লাগছে না।

(ক) মানানসই ফিটিং পোশাক তৈরির অন্যতম শর্ত কী?

(খ) কোন পদ্ধতিতে দ্রুত প্যাটার্ন তৈরি করা যায়– বুঝিয়ে বলো।

(গ) উদ্দীপকের মাপ অনুসারে একটি কিচেন অ্যাপ্রোনের ড্রাফট তৈরি করো।

(ঘ) ফিরোজা বেগমের শরীরে কিচেন অ্যাপ্রোনটি সঠিকভাবে লাগার জন্য ড্রাফট আবশ্যক– তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম–গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

নারীশিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।